মগ্নচন্দ্রা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাণীশিল্প কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৬১

প্রকাশক
উৎপল হালদার
বাণীশিল্প
১১৩ই, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬ বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

নষচন্দ্রা

॥ এক ॥

ষ্টেশনে তার জন্যে কেউ আসেনি। কে-ই বা আসত ?

লোকটা যখন প্ল্যাট্‌ফর্মে নেমে দাঁড়ালো, তখন পশ্চিমমুখো সূর্যের রঙ পড়েছে পূবের মেঘে। তখন একঝাঁক পানকৌড়ি যেন রক্তের নদীতে স্নান সেরে উড়ে যাচ্ছিল আর দূরের মাঠে ঘরে-ফেরা মোষের পাল রঙিন ধুলোর কুয়াশা দিয়ে বাবলার বনটাকে আড়াল করে দিচ্ছিল।

ছোট লাইনের ছোট গাড়ীও বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না। দক্ষিণ দিকের ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগনাল পার হয়ে একটা শুঁয়ো পোকার মতো হারিয়ে গেল গোধূলির ভেতরে। হাওয়ায় হাওয়ায় লাইনের ধার থেকে বনতুলসীর মর্মর উঠতে লাগল, একটা শুকনো গন্ধ আসতে লাগল মাটি আর ঝোপঝাড় থেকে, রেল লাইন আর প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে এঞ্জিনের ধোঁয়া আর ঝাপটায় বিবর্ণ ঘাসের গুচ্ছ থেকে একটা ঝিঁঝি অবসন্ন গলায় রী-রী করে উঠল।

লোকটার তখন খেয়াল হল যে অনেকক্ষণ ধরে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। হয়তো কুড়ি মিনিট, হয়তো আরো বেশি। হাঁটু দুটো তার টাটিয়ে উঠেছে, হাতের ব্যাগটা অনেক বেশি ভারী বলে মনে হচ্ছে এখন। বহুক্ষণ আগেই স্টেশন মাস্টার এসে তার টিকেটটা চেয়ে নিয়ে গেছেন, তার সঙ্গে যে আরো চার পাঁচটি যাত্রী নেমেছিল তারা মাঠের পথ ধরে কে কোথায় চলে গেছে। পয়েণ্টস্‌ম্যানটা স্টেশনের নামলেখা বাতিতে আলো জ্বালছে, আর—আর মাথার ওপরে আকাশটা আরো ধূসর হয়ে পৃথিবীর ছায়ার দিকে নুয়ে পড়েছে।

এবার যাওয়া দরকার।

ফাঁকা মাঠের ভেতর এই স্টেশন। সব চাইতে কাছের গ্রামটিও দু মাইল দূরে, যদিও স্টেশনটা তারই নামের গৌরব-ধন্য। সেই গ্রাম ছাড়িয়ে, আরো অনেক মাঠ আর ছোট ছোট সাঁওতাল পাড়া পেরিয়ে, খানিকটা হতশ্রী জঙ্গলের ভেতর কবেকার একটা ভাঙা গীর্জার ধ্বংসস্তূপ পাশে রেখে, একটা নদীর খেয়া পাড়ি দিয়ে তবে তার পথের শেষ। প্রায় বারো মাইল।

এই রাস্তা তাকে হাঁটতে হবে। হাঁটা ছাড়া গতি নেই।

সামনের গ্রামে হয়তো গোরুর গাড়ী পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই রাতে অন্তত পাঁচটা টাকা না পেলে কেউ দশ মাইল রাস্তা যেতে রাজী হবে না। আট বছর জেলে কাটিয়েও সে জানে, এর ভেতরে অনেক বদলে গেছে দিনকাল। ধানের দর বেড়েছে, মানুষের খিদে বেড়েছে আর সেই সঙ্গে কমে এসেছে টাকার দাম। তার ছেলেবেলাতে এদিকের মানুষ চার টাকা মণ দরে চাল কিনেছে, এখন ত্রিশ টাকার কমে তা ছোঁয়া যায় না। দশ টাকা দিয়ে সেদিন যারা বলদ কিনত, আজ ষাট টাকার কমে তারা তা ভাবতেও পারে না। কাজেই দশ মাইল যেতে যদি পাঁচ টাকাতেও রাজী হয়, তা হলে তা-ও সস্তাই বলতে হবে।

কিন্তু পাঁচ টাকা দিয়ে গাড়ী চড়বার বিলাসিতা তার জন্যে নয়। কী ভেবে একবার পকেটে হাত দিয়ে সে কয়েক আনা খুচরো পয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করল, হাতে ঠেকল কয়েকটা বিড়ি আর ছোট চিরুনিটা। চিরুনির ওপর তার আঙুলগুলো থমকে দাঁড়ালো একবার! আট বছরেরও বেশী আগে দু' আনা দিয়ে কিনেছিল, আট বছর ওটা দিয়ে সে চুল আঁচড়ায়ওনি। ওর গায়ে সেই তৈলাক্ত মসৃণতা আর নেই, কেমন শুকনো খসখসে হয়ে গেছে। বাঁ দিকের পকেটে হাত না দিয়েও বুঝতে পারল—সেখানে নীল হয়ে যাওয়া সেই ছোট্ট পেতলের চাবিটা এখনো আছে—যা দিয়ে কলকাতায় একটা ঘরের তালা আট বছর আগে সে খুলত আর বন্ধ করত—কিন্তু আজকে সে চাবি তার কোনো কাজেই আর লাগবে না।

জেল থেকে বেরুবার মুখে গ্রেপ্তারের সময় যা-যা তার সঙ্গে ছিল সবই ফেরত দিয়েছে। শুধু তাকে দেয়নি রক্ত-মাখা ধুতি সার্ট, সেগুলো পুলিশের সাক্ষী হিসেবে কাজ করেছিল। তার বদলে নতুন কাপড়-জামা দিয়েছে তাকে। কাপড়টা কোরা, আর জামাটা এখনো তার ঘামের সঙ্গে মেশানো নতুনের অদ্ভুত গন্ধ ছাড়ছে একটা।

ডান পকেট থেকে একটা বিড়ি ধরে মনে পড়ল, ট্রেন থেকে নামবার আগেই দেশলাইটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, আর কেনা হয়নি। রেলের পয়েন্টসম্যানটা দু-দুটো আলো জ্বেলে দিয়ে গেল, ওর কাছ থেকে নিশ্চয় দেশলাইটা একবার চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু লোকটার আর উৎসাহ হল না। তখন টের পেলো, গলাটা বড্ড বেশি শুকিয়ে গেছে, সারাদিন বিড়ি টেনে টেনে ঠোঁটের কোনা দু'টো জ্বালা করছে, একটু আগেই খানিক শুকনো কাশি উঠে তার ফুসফুসটাকে প্রায় টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। বিড়ি এখন থাক।

স্টেশনের আলো দু'টো আরো উজ্জ্বলে উঠছে—রাত নামল। আর দেরী করা চলে না। বারো মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে তাকে, একটা খেয়াও আছে তার ভেতর। উত্তরে দক্ষিণে সিগনালের দু'টো

রাঙা চোখের দিকে সে চেয়ে দেখল একবার, তারপর আড়ষ্ট পা দু'টোকে জোর করে নাড়া দিয়ে চলতে আরম্ভ করল, চলে এলো স্টেশনের বাইরে।

একটা মানুষ নেই, একটি আলো নেই, এমন কি স্টেশনের চৌহদ্দির বাইরে কোথাও পৃথিবীটা বেঁচে আছে কিনা তাতেই সন্দেহ হয়। স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার পর্যন্ত তৈরী হয়নি, স্টেশনের ছোট ঘরটিতেই তাঁকে আর তাঁর পয়েণ্টস্‌ম্যানকে থাকতে হয়। দু'মাইল দূর গ্রামের জমিদারেরা চেষ্টা করে স্টেশন বসিয়েছিলেন, কিন্তু রাতে দিনে যেখানে দুখানা ট্রেন থামে আর আট দশটি যাত্রী ওঠানামা করে, সেখানে অকারণে একটা পান-বিড়ির দোকান খোলবার কথা পর্যন্ত কেউ ভাবতে পারে না।

তাই একটু পরেই লোকটা যে মেঠোপথ ধরল, তার দুধারে ফসল-কাটা ধান ক্ষেত, বেনার ঝাড়, জংলা ফুলের বন, এক একটা হিজল আর বাবলা গাছের ভুতুড়ে মূর্তি আর থরে থরে জোনাকি। সন্ধ্যার পর ফাঁকা মাঠে হু-হু করে রুক্ষ হাওয়া দিয়েছে, ধুলো আর কাঁকরের ঝাপটা আসছে এক একটা, আর লোকটা হেঁটে চলেছে।

বারো মাইল রাস্তা।

কিন্তু কেন চলেছে? কী দরকার ছিল?

ভাবতে গিয়ে উঁচু-নীচু পথটায় একটা ঠক্কর খেলো সে! জেল-খানায় যে আঙুলটার ওপর একবার একখানা ইঁট পড়ে থেঁতলে গিয়েছিল, সেখানে একটা হিংস্র যন্ত্রণা আর্তনাদ করল, যেন মাথার শিরা পর্যন্ত বয়ে গেল বিদ্যুতের তরঙ্গ। বিকৃত মুখে লোকটা বসে পড়ল ধুলোর ওপর। কিছুক্ষণ চোখের সামনে অন্ধকার কাঁপল, তারপর সেই অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে ঝিলমিল করে জ্বলে উঠল জোনাকিরা। লোকটা কয়েক মিনিট ধরে ভাবতে চেষ্টা করল ওই জোনাকিগুলো কোথায় জ্বলছে—তার মাথার ভেতরে, না বাইরে!

বসে থাকলে চলবে না, এখনো অনেক পথ তার সামনে। থাবে

ধীরে উঠে দাঁড়াতে হল। পায়ের যন্ত্রণাটা অনেকখানি ভোঁতা হয়ে এসেছে এখন। কিন্তু প্রশ্নটা যায় না। কেন চলেছে, কোথায় চলেছে?

চলেছে তার গ্রামে। তার বড়ো ভাইয়ের কাছে।

বড়ো ভাই যদি বলে, কেন এসেছ তুমি? কি চাও?

উত্তরে বলবে: কিছুই চাই না, দিনকয়েকের আশ্রয় দাও!

বড়ো ভাই হয়তো বলবে: কোন্ লজ্জায় এসেছ এখানে? তোমার জন্যে আমাদের মুখ দেখাবার পর্যন্ত জো নেই, সে কি তুমি জানো না?

তখন বলতে হবে: আট বছর আগে যা ঘটে গেছে, তার দাগ কি এখনো মোছেনি?

হয়তো জবাব আসবে: সব দাগ মুছে যায়, রক্তের দাগ মোছে না।

তা হলে? তারপর?

মনে মনে এতদূর পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর সাজিয়ে তার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আর ভাবতে ইচ্ছে করে না—ভাববার শক্তিও তার নেই। পরের কথা পরে। এখনো অনেক দূরের পথ তার সামনে।

একটু আগেই যেন অন্ধকারে তলিয়ে ছিল চারদিক—চাঁদ ওঠেনি আজকে। কিন্তু চলতে চলতে সন্ধ্যার বিমর্ষ অপচ্ছায়াটা কাটিয়ে আকাশ খুশি হয়ে উঠল, রাত্রির বাতাসে স্নান করে তারাগুলো আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল হল, আর সেই তারার আলো খুব ফিকে জ্যোৎস্নার ছায়ার মতো তার সামনের পথটাকে অনেকখানি স্পষ্ট করে তুলল। লোকটা পথের ছোটখাটো গর্তগুলোকেও দেখতে পেল এখন, এমন কি তার ডানদিকে মাঠের ভেতর ছড়িয়ে-থাকা গোরুর কতগুলো হাড়-পাঁজরাও তার চোখ এড়াল না।

কিন্তু কে যায় সামনে দিয়ে? কার হাতে অত বড়ো লণ্ঠন জ্বলছে একটা?

ভাঙা গলায় ডেকে উঠতে যাচ্ছিল, কে যায়—কিন্তু তার আগেই দপ্ করে নিভে গেল লণ্ঠনটা। অনেকখানি সরে গিয়ে হঠাৎ জ্বলে উঠল আবার। আলেয়া!

আজ অনেকদিন সে আলেয়া দেখেনি। শুধু আট বছরই নয়, এতকাল যে হয়ে গেল তা মনেই করতে পারে না। ছেলেবেলায় আলেয়া দেখলে ভয় পেত, জানত ওরা অশরীরী—রাত্রে পথভোলা মানুষকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হয়রাণ করে শেষ পর্যন্ত কোনো অন্ধকার জলায় নিয়ে যায়—তার মাথাটা পুঁতে দেয় কাদার ভেতর। কিন্তু সে ভয় আজ আর নেই। আজ চল্লিশ বছর পার হবার পর সে জানে: আরো অনেক, অনেক আলেয়া আছে, শুধু একটি রাতেই নয়, সমস্ত জীবনেও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে না।

আশ্চর্য! কী ভাবে সুরু হল।

সেই গ্রামের স্কুল থেকে একটা স্কলারশিপ, তারপর কলকাতার সব চাইতে নামজাদা কলেজের ছাত্রজীবন। সেই পাড়াগাঁয়ে নিটোল স্বাস্থ্য, কলেজ স্পোর্টসে ট্রফির পর ট্রফি। আই-এস্‌সি-তে বৃত্তিটা কাছ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। তা হোক, বি-এস্‌সি অনার্সে পুষিয়ে নেব।

তখন কলকাতায় যুদ্ধ। সাইরেনের আর্তনাদে উচ্চকিত রাতগুলো! কালো ঠোঙায় ঢাকা আলো, সারি সারি ব্যাফল-ওয়াল, মন্বন্তরের মড়ার সঙ্গে অসতর্ক মুহূর্তে হোঁচট খাওয়া। মা তখন বেঁচে, তাঁর কান্নাভরা চিঠি এল: আর পড়তে হবে না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো।

ঘরে সে ফিরল না। কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে একবার ভরা বর্ষার গঙ্গা সে সাঁতরে পার হয়ে গিয়েছিল, সেদিন জেনেছিল, জীবন-মৃত্যুর ঠিক সীমান্তলগ্নে পৌঁছে কী আশ্চর্য অপরূপ নেশায় দেহ-মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়! একদিকে প্রচণ্ড তীব্র স্রোত যেন তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নিতে চাইছে, আর একদিকে পোর্ট কমিশনারের একটা লঞ্চ থেকে তিনজন খালাসী চিৎকার করে বলছে: সাবাস—সাবাস!

ওপারে পৌঁছে প্রায় আধ ঘণ্টা শুয়ে থেকে ছিল গঙ্গার ঠাণ্ডা কাদার ওপর, হৃৎপিণ্ডে ঝড়ের মাতন চলছিল তার। আর একটু—আর একটু হলেই ঠিক মাঝ নদীর ঘূর্ণিটায় সে তলিয়ে যেত, তারপর গঙ্গার চোরা স্রোত কোথায় কতদূরে নিয়ে গিয়ে তাকে ভাসিয়ে তুলত কে জানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ই জিতেছে। তার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে বাজছে খালাসীদের সেই চিৎকার: সাবাস—সাবাস, ভাই!

সেই একটা নেশায় তাকে ধরল: সেই জীবন-মৃত্যুর ঠিক কেন্দ্রটিতে দাঁড়িয়ে এক অপূর্ব অনুভূতিতে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া। বাড়ী ফেরবার জন্যে বিছানা বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে, সোজা চলে গেল এয়ার-ফোর্সের রিক্রুটিং অফিসে।

তারপর ট্রেনিং। রাইফেলে লক্ষ্যভেদ। এরোপ্লেনের জটিল যন্ত্রগুলোকে চিনে নেওয়া। তারও পরে হাতের ছোঁয়া লাগতে না লাগতে বাঁধা সেতারের মতো স্পিট ফায়ারের গুঞ্জন, মাটি থেকে আকাশ, আকাশ থেকে আরাকান সীমান্ত।

কী দিন—চোখের সামনে কী সব মুহূর্তগুলো!

হঠাৎ লোকটা চমকে উঠল। পথের ধারে বুড়ো একটা কুলগাছে আলোকলতার ঝরকা দুলছে, তারার আলোয় সয়ে যাওয়া চোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেটা। কিন্তু দেখবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবি জাগল। প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে প্রকাণ্ড উঁচু গাছের মাথা থেকে ঝুলছে একজন—ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মেশিনগানের গুলিতে আর সেই অবস্থায় তাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে চিল-শকুন, থেকে থেকে নীচে ঝরে পড়ছে এক একটা কালো পচা মাংসের টুকরো। দুর্গন্ধে সমস্ত বনের বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে।

তাদের দলের কে একজন যেন আবার সেটার দিকে রাইফেল তুলে টার্গেট প্র্যাক্টিস করছিল।

লোকটা এক মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করল। কিন্তু দৃশ্যটা

সামনে নয়, মনের ভেতর। সেখানে রাত্রি নামে না। সামনের আকাশের জ্বলজ্বলে তারার মতো স্মৃতির হিংস্র অঙ্গারগুলো একভাবে জ্বলতে থাকে সেখানে।

সামনে দিয়ে একটা ছুটন্ত শেয়াল তাকে অন্যমনস্ক করল। আগে এসব দিকে মাঝে মাঝে দু' একটা দাঁতাল শূয়োরের দেখা মিলত। এখনো তারা আছে নাকি? থাকলে মুশ্‌কিল এই উঁচু-নীচু মাঠের পথে, এই রাতে দৌড়ে পালানোও অসম্ভব। ভয়েব ধমকে চলার গতি বাড়িয়ে দিল সে।

একটু আগেই যেন রাত্রির বুক চিরে প্রকাণ্ড পাহাড় মাথা তুলেছে একটা। ওটা পাহাড় নয়, বটগাছ। এতদিন পরেও লোকটা চিনতে পারল—ওখানেই তো শ্যামের হাট। কে শ্যাম, কোথায় সে থাকত, কেউ তা জানে না! কিন্তু ফাঁকা মাঠের ভেতর, একটুখানি উঁচু ডাঙার ওপর—ওই বটগাছের তলায় প্রত্যেক মঙ্গলবার একটুখানি হাট বসে। মানুষজন কেউ থাকে না, কেবল কয়েকটা খড় আর টিনের চালা। বাকী ছ'দিন শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করে।

লোকটা ধীরে ধীরে হাটের কাছে এসে পৌঁছুল। এতক্ষণে অর্ধেকের বেশি পথ সে পেরিয়েছে। রাত কত হয়েছে আন্দাজ নেই, আটটা হতে পারে, ন'টাও হতে পারে। কিন্তু টনটন করছে পা দুটো, থেঁতলে যাওয়া আঙুলটায় আবার যন্ত্রণার ঝিলিক। একটা মাটির ভাঁড় গুড়িয়ে, বটের শিকড়ে আবার ছোট মতন একটা হোঁচট খেয়ে সে গাছতলায় এসে বসল। জিরিয়ে নেওয়া দরকার।

তাকে ঘিরে ঘিরে হাটের স্পর্শ। আজ বৃহস্পতিবার, পরশু হাট হয়ে গেছে। এখনো পচা সবজীর গন্ধ, শুকনো লঙ্কা আর মশলার গন্ধ, গোবর আর ধুলোর গন্ধ। পরশু সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক লোক এখানে ছিল, তারা নেই—কিন্তু তাদের অস্তিত্ব যেন বটগাছের এই গুমোট ছায়ায় থমকে আছে এখনো। লোকটা পকেট থেকে আবার বিড়ি বের করতে গেল, আবার মনে পড়ল তার দেশলাইটা ফুরিয়ে

গেছে অনেকক্ষণ, আবার আট বছর আগেকার সেই শুকিয়ে যাওয়া খরখরে চিরুনিটা তার হাতে ঠেকল।

ইচ্ছে হল, চুলটা একবার আঁচড়ে নেয়। কিন্তু ভাবতেই তার হাসি পেল। মাথার অর্ধেকটা জুড়ে টাক পড়েছে, বাকীটা জেলের নিয়ম মাফিক ছোট ছোট করে ছাঁটা। বাঁ পকেটের নীল হয়ে যাওয়া পেতলের চাবিটা দিয়ে যেমন কোনোদিন কোনো তালা আর সে খুলবে না, তেমনি এই চিরুনিটার দরকারও তো তার চিরদিনের মতোই ফুরিয়ে গেছে।

তবু জেল গেটে ফর্দ মিলিয়ে ওরা সব তাকে ফেরত দিয়েছে। রসিকতা? না—ওই ওদের নিয়ম। কিন্তু কী হবে এগুলো দিয়ে? একবার ভাবল, ছুঁড়ে ফেলে দিই, তারপরেই ভাবল—কী হবে?

কী হবে? নিজেকে নিয়েই বা তার কী হবে?

ওরা তাকে সব ফেরত দিয়েছে—কিন্তু আট বছর আগেকার জীবনটা আর ফিরিয়ে দেয়নি। তার বদলে নিয়ে এসেছে মৃগী রোগ। যখন তখন সেটা দেখা দেয়—যেখানে সেখানে এলিয়ে পড়ে, ছুঁড়তে থাকে হাত-পা, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে থাকে! সেই সব অসতর্ক মুহূর্তে যদি কোনো মানুষ এসে পাশে না দাঁড়ায়—

আচমকা যেন শিশুর গলার বিকৃত কান্না অন্ধকার আর নৈঃশব্দটাকে শিউরে তুলল। ভয়ে কেঁপে উঠতে গিয়েও সামলে নিলে লোকটা। তার মনে পড়ল বকের ছানা ওই ভাবেই কাঁদে, এই বটগাছে তাদের বাসা আছে। আর তখনই অনুভব করল, তার সারা শরীরে কী যেন অস্বস্তির ছোঁয়াচ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে—যেন স্নায়ুগুলোর ভেতর থেকে উঠে আসছে একরাশ কুয়াশা।

মৃগী?

একটা সম্ভাবনা বিদ্যুতের মতো বয়ে গেল ভাবনার ভেতরে। যদি এখনই—এইখানেই মৃগী এসে আক্রমণ করে তাকে? যদি অজ্ঞান হয়ে যায়, মুখ দিয়ে ফেনা তুলে হাত পা ছুঁড়তে থাকে? একটি

মানুষ নেই, কোনো সহায় নেই—রাত্রির এই ফাঁকা মাঠের ভেতর, এই অন্ধকার বটতলায় হয়তো জ্যান্ত অবস্থাতেই তাকে শেয়ালে এসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে! গাছের মাথায় ঝুলন্ত প্যারাসুটের সঙ্গে সেই বিকৃত মৃতদেহটাকে মনে পড়ল—তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো সে।

পথ—আবার পথ।

বারো মাইল যেন এই রাতে বাষট্টি মাইলেরও সীমা পার হয়ে গেছে। এতক্ষণে সে চলেছে গ্রামের ভেতর দিয়ে। রাত কত? দশটার বেশি নয়। তবু ঘরে ঘরে পাথরের মতো ঘুম স্তব্ধ হয়ে আছে, প্রলয় হয়ে গেলেও গ্রামের মানুষ আর জাগবে না। মাথা খুঁড়ে মরলেও একটি ঘরের দরজা খুলবে না এখন—সারাদিনের ক্লান্তি আছে, ডাকাতের ভয় আছে, আছে অপদেবতার আতঙ্ক।

তার মনে পড়ল এই অঞ্চলের বাণ মারার কাহিনী। এমনি এক একটা চন্দ্রহীন রাতে—আজ অমাবস্যা কি না তাই বা কে জানে—গ্রামের গুণিনেরা শত্রুকে বাণ মারতে বেরোয়। দরজায় এসে তিনবার ডাক দেয় তারা—তিন ডাকের মধ্যে সাড়া দিয়ে যে বেরিয়ে আসে, তার তিন মাসও আর পার হয় না, মুখ দিয়ে রক্ত তুলতে তুলতে ফুরিয়ে যায় সে।

একবার একটুকরো সিঁদুরমাখা কলাপাতা দেখেছিল। তার ওপরে ছোট একটা ফুলের মূর্তি—বুকের ভেতরে একটা কাঠির তীব বিঁধে আছে। কোন্ হতভাগা তার লক্ষ্যের শিকার হয়েছিল, সে আজও জানে না।

একদল কুকুরের চিৎকারে ঘোর ভাঙল।

আবার পথ।

গ্রাম পেরিয়ে আম বাগান, তারপরে নদী।

রুপালী স্রোত বয়ে চলেছে ছল্‌কে ছল্‌কে। খেয়া মাঝির ঘর অন্ধকার। খেয়া নৌকো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মতো। এত রাতে কি আর পার করে দেবে? না—আশা নেই।

এক মুহূর্ত ভাবল লোকটা। তারা আর নদীর মাঝখানে আদিম মানুষের মতো সে একা। বিনা দ্বিধায় সে উলঙ্গ হল শিশুর মতো, জামা-কাপড় পাগড়ীর মতো মাথায় বাঁধল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে।

কী ঠাণ্ডা—কী ঠাণ্ডা জলটা। বুকের ভেতরে একটা চিতা জ্বলছিল যেন, জুড়িয়ে গেল এতক্ষণে। বর্ষার ভরা গঙ্গা নয়—জীবন-মৃত্যুর সন্ধিলগ্ন নয়, এ যেন তার ছেলেবেলার খুশির খেলা, অনেকগুলো বছর, অনেক বয়েসের দুঃস্মৃতিকে ভুলে গিয়ে আবার একটা নির্মল—উজ্জ্বল জীবনের ভেতরে তার অবতরণ।

কিছুক্ষণ জল নিয়ে খেলা করল, কুলকুচি করল, পিপাসায় শুকিয়ে আসা গলাটাকে প্রাণপণে তৃপ্ত করে নিলে, তারপর যখন এপারে এসে পৌঁছোল, তখন হঠাৎ যেন তার মনে হল, একটা মৃত্যুর বৈতরণী পার হয়ে সে আর একটা নতুন শৈশবের মধ্যে ফিরে এসেছে।

আরো আধঘণ্টা পরে একটা নিস্তব্ধ ঘুমন্ত বাড়ীর সামনে অদ্ভুত গলার ডাক উঠল: দাদা—দাদা!

॥ দুই ॥

দরজা খুলল পীতাম্বর নন্দী। হাতের পুরনো লণ্ঠনটার লালচে আলো পড়ল লোকটার মুখে। সদ্য ঘুমভাঙা ঘোর ঘোর চোখে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল পীতাম্বর, যেন তখনো বুঝতে পারছে না—যেন তখনো স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ডুবে আছে সে। যা দেখছে তা বিশ্বাস করা উচিত, কিন্তু বিশ্বাস করা সহজ নয়।

লোকটা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দাদার দিকে। পীতাম্বরের মাথায় পাকা চুল চকচক করছে, কপালে শুকনো ছুরির আঁচড়ের মতো কয়েকটা কালো কালো রেখা। আট বছরের ভেতর অনেক বয়স বেড়ে গেছে দাদার। লোকটার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল, কেঁপে উঠলো গলার আওয়াজ: আমি নীলু—নীলাম্বর। আমাকে চিনতে পারছ না দাদা?

লণ্ঠনের লাল আলোয় পীতাম্বরের চোখ আবার ঝাপসা হল, এক ফোঁটা জল গড়িয়ে নামল বাঁ গাল বেয়ে। লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ দুহাত বাড়িয়ে ভাইকে টেনে নিলে বুকের ভেতর, চেপে ধরল প্রাণপণে, একটা তীক্ষ্ণ আর্তস্বর ফুটে বেরুল: নীলু!

তখন সারা বাড়ীর ঘুমন্ত স্তব্ধতা হঠাৎ খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল যেন, ভেসে উঠল অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ, দাদার পেছনে চোখে পড়ল বৌদির বিবর্ণ মুখ, একটি কিশোরীর টানা টানা চোখের অবাক দৃষ্টি, আরো ক'টি ছেলেমেয়ের আবছায়া আভাস।

বৌদি মলিনা বললে, কে—কে? ঠাকুর পো!

—হ্যাঁ বৌদি, আমি। আমিই ফিরে এসেছি জেল থেকে।

প্রথম আবেগ আর বিস্ময়ের পালাটা যখন মিটল, তখন দু'ভাই ভেতরের বারান্দায় দুটো বেতের মোড়া পেতে বসল পাশাপাশি।

মলিনা এর ভেতরেই ছেলেদের ধমক দিয়ে তার শোওয়ার ঘরের মস্ত মশারিটার ভেতরে ফেরত পাঠিয়েছে, নিজে চলে গেছে রান্নাঘরে, চালে ডালে খিচুড়ি চাপিয়েছে নীলাম্বরের জন্যে। নীলাম্বর বলেছিল, এত রাতে তার কিছুই দরকার নেই, মাত্র এক গ্লাস জল আর একটু শোবার জায়গা হলেই চলবে, কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয়নি।

দু'ভাই চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। রাত অনেক। সামনে কালপুরুষ হেলে পড়েছে পশ্চিমে। পূবের আকাশে একটু লালের আভাস, মাঝরাতের চাঁদ উঠছে। হাওয়ায় এতক্ষণে শিরশিরাণির ছোঁয়া, রান্নাঘরের পাশে কয়েকটা পেঁপে গাছে আওয়াজ উঠছে, একটা শুকনো পাতা খসে পড়ল এইমাত্র। টুপ করে একটা জলের ফোঁটা পড়ল উঠোনে আশ্বিনের প্রথম শিশির। বাঁ দিকে পাঁচিলের কাছে চোখ চলে গেল নীলাম্বরের, সেই বুড়ো শিউলি গাছটা এখনো দাঁড়িয়ে —তার আকাবাঁকা ডালগুলো ভরে শিউলি ফুটতে শুরু হয়েছে। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক চলেছে। খিড়কির বড়ো পুকুরটা থেকে মাছের ছলাৎ ছলাৎ কানে এল।

এই বাড়ীতে তার জন্ম—এখানকার সবকিছু তার চেনা। এমন রাত, হিমের ছোঁয়া লাগা বাতাসে শিউলির গন্ধ, পুকুরের জলে মাছের শব্দ—সব তার রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তবু কত নতুন—কত অচেনা মনে হয়। বুক ভরে শ্বাস নিলে নীলাম্বর, ছেড়ে দিলে আস্তে আস্তে, আর তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে যেন কথা খুঁজে পেলো পীতাম্বর।

—কবে ছাড়া পেলি?

—পরশু।

—একটা চিঠি দিলিনে কেন? তাহলে স্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দিতুম।

একটু চুপ করে রইল নীলাম্বর। তারপর বললে, ভেবেছিলুম, দেব। শেষে মনে হল, চলেই যাই। স্টেশনে তো গোরুর গাড়ী থাকবেই।

আজকাল থাকে না। পীতাম্বর টিনের একটা কৌটো থেকে বিড়ি বের করে ধরালো। আকাল যাচ্ছে কি না। মাঠের ভেতরে প্রায়ই ডাকাতি হয—তাই সন্ধ্যের পর গোরুর গাড়ী যেতে চায় না, লোকের চলা-চলতিও কম

—ডাকাতি ?—যেন স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল নীলাম্বর। মনে পড়ল, হযতো এইজন্যই এতখানি পথ পাড়ি দিয়েও একটি মানুষেব সঙ্গেও তার দেখা হয়নি, এই জন্যই গ্রামেব পর গ্রাম তার শ্মশানের মতো মনে হয়েছে। কিন্তু কেউ তো তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল না, কয়েকটি খুচরো টাকা আর আনা কয়েক পয়সা কেড়ে নেবাব জন্যে লাঠি বল্লম নিয়ে তো হাজির হল না কেউ। নাকি, সেই অন্ধকাব পথেব একলা যাত্রী খুনীকে ডাকাতেবাও চিনে নিয়েছিল ?

নীলাম্বর ঠিক শুনছিল না, কিন্তু নিজের কথাব খেই টেনে যাচ্ছিল পীতাম্বর। বিড়িব ধোঁয়া ছাড়ছিল আব অনেকক্ষণ ধরে যে একটাও বিড়ি খাওয়া হযনি, নীলাম্বরকে সেই কথাটা ছাড়া ছাড়া মনে করিয়ে দিয়ে বলে চলেছিল, ডাকাতি ছাড়া কি আর করবে ? গোটা দেশটা দেখে আয়, চাষীদের ঘবে একমুঠো খাবাবও নেই বললেই চলে। নতুন ধান না ওঠা পর্যন্ত কি কবে যে এবা চালাবে তা বোধহয় স্বয়ং ভগবানও বলতে পাবেন না। তাই চুবি ডাকাতি বাহাজানি হামেশা চলছে। এই তো এক মাসও হয়নি, আমাদেব বড় ঘরটাতে সিঁদ দিয়েছিল। জানিস তো, তোব বৌদিব ঘুম খুব পাতলা, একটু আওযাজ পেতেই চেঁচিয়ে ওঠে, লোকগুলো ছুটে পালায়। বুঝলি, কাবো এতটুকু সোয়াস্তি নেই এদেশে। আমাদের এখানে তবুও তো থানা আছে, দূরেব গাঁয়ে গাঁয়ে প্রায় রোজ রাতেই ডাকাত পড়ছে।

আচমকা খানিকটা ধোঁয়া গিলে কিছুক্ষণ কাশল পীতাম্বব। মলিনার রান্নাঘরে খিচুড়ি ফুটে উঠেছে, শিউলির গন্ধ, শিশির পড়া মাটির গন্ধ আর রাত্রির একটা আলাদা নিজস্ব গন্ধ—তাদের সকলকে

ছাপিয়ে খিচুড়ির মিষ্টি গন্ধটা ভেসে এল এদিকে। এতক্ষণে নীলাম্বর আবার টের পেলো, ক্ষিধের যন্ত্রণায় তার নাড়ী থেকে থেকে মোচড় দিয়ে উঠছে, কতকাল—কতদিন সে খায়নি।

পীতাম্বর বলতে লাগল: নতুন ধান উঠলেই বা কি? সস্তা হবে? দেখতে দেখতে তো সেই বত্রিশ টাকা। কী করে যে লোকে বেঁচে আছে আজকাল। —বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরে একসঙ্গে অনেক লোক মরেছিল, খুব হৈ চৈ হয়েছিল তা নিয়ে। কিন্তু এখন একটু একটু করে লোক মরছে—টের পাওয়া যাচ্ছে না সহজে, ওদিকে তিলে তিলে সব উজাড় হয়ে এল। ডাল তেল নুন মশলা—কী দাম বেড়েছে সব কিছুর। চিনি তো মাসের ভেতরে কুড়িদিন নজরেই আসে না। কী সুখে যে আছে সবাই—পীতাম্বর বিস্বাদভাবে হাসল: ওদিকে আবার পূবপাড়া রেল ইস্টিশন থেকে আমাদের গাঁয়ের ওপর দিয়ে পাকা রাস্তা হয়ে গেছে। মানুষ খেতে না পাক, বাঁধানো রাস্তা দিয়ে বাসে করে যেতে আসতে পারবে, তা-ই বা কি কম কথা? তুই যদি পূব পাড়ায় নামতিস তা হলে পায়ে হেঁটে আর এত কষ্ট করে তোকে আসতে হত না—সন্ধ্যের পরেই বাসে পৌঁছে যেতিস। এদিককার সবাই-ই আজকাল তাই করে।

মলিনার খিচুড়ির গন্ধে বাতাসটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। ক্ষিধের যন্ত্রণাটা আরো নিষ্ঠুর হয়ে সাড়া দিচ্ছে এখন। বাইরে শেয়ালের দলবাঁধা ডাক উঠল—রাত দুপুর। এতক্ষণ পরে একটা ভয়ের চমক অনুভব করল নীলাম্বর। পীতাম্বরের কথা শুনতে শুনতে যখন সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সেই আট বছর আগেকার রাতটা। নির্জন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—ঝোড়ো হাওয়ার সামনে মস্ত শিরিষ গাছটা যেন নুয়ে পড়তে চাইছিল মাটিতে, পাশের জলায় ব্যাঙের একটানা গোঙানি উঠছিল, ট্যাক্সির ভেতরে বয়ে যাচ্ছিল রক্তের স্রোত, আর একটু দূরেই তিন চারটে শেয়াল একসঙ্গে—

রান্নাঘর থেকে একটা কেরোসিনের ডিবে নিয়ে এল মলিনা।

—হাত মুখ ধুয়ে নাও ঠাকুরপো, আমার খিচুড়ি তৈরী।

পীতাম্বর বললে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওঠ এবার। অনেক রাত হয়ে গেছে।

শুতে শুতে ঢং করে একটা আওয়াজ উঠল পীতাম্বরের ঘর থেকে —ঘড়ির শব্দ। আর একটু পরে দূরের থানায় পেটা ঘণ্টা থেকে অমনি আর একটা আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে বয়ে গেল ঘুমন্ত গ্রামের বুকের ভেতর দিয়ে। রাত একটা।

বিছানায় চোখ খুলে শুয়ে রইল নীলাম্বর। আরো অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ঘুম আসছে না। বহু দিন পরে যেন আজ সে খেতে পেয়েছে, এত বেশী করে খেয়েছে যে পাশ ফিরে শুতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে তার।

নীলাম্বর চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। বিছানার পাশেই একটা টিপয়ের ওপর শেষ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া লণ্ঠনটা মিট মিট করছে, ঘরটাকে ছায়া ছায়া দেখা যায়। মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়েই দেখা যায় সব—কাত না ফিরলেও চলে। বিছানাটা অদ্ভুত নরম, মাথার বালিশের ওয়াড়ে ফুল কাটা রয়েছে, মশারিটি বোধহয় কোরা—একটা নতুন গন্ধ আসছে তা থেকে। পরনের নতুন কাপড়টার কথা মনে পড়ল—ঘামে আর ময়লায় সেটা স্যাঁৎ স্যাঁৎ করছে, বদলে নিলে হত। কিন্তু শরীরে তার একবিন্দু উদ্যমও আর অবশিষ্ট নেই এখন।

বাইরে আশ্বিনের শিশির পড়ছে—টিনের চালের ওপর তার টুপ টুপ আওয়াজ। কিন্তু ঘরটা গরম—মশারির ভেতরে আরো গরম লাগছে। মাথার কাছের জানালাটা মলিনাই বন্ধ করে দিয়ে গেছে বলেছে, শেষ রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে যাবে, হঠাৎ জ্বর হয়ে যাবে তা হলে।

সব সেই রকম। আর সেই শোবার ঘর। আট বছর পরেও দেওয়াল আলমারিতে তার প্রাইজ পাওয়া সেই বইগুলো। এয়ার ফোর্সে থাকবার সময় একবার বাড়ীতে এসে নিজের মিলিটারী বেশ-পরা একটা ফটো টাঙিয়ে গিয়েছিল দেওয়ালে, সেটা এখনো আছে। দাদার বিয়ের সময় এই ঘরের দেওয়ালে বসুধারা আকা হয়েছিল, এখনো ঘি আর সিঁদুরের দাগ দেখা যায়। অল্প স্বল্প অদল বদল

হলেও এখনো সব একরকম। শুধু সে-ই এখানকার কেউ নয়; এই জীবন থেকে—এখানকার চেনা মানুষের কাছ থেকে, সে কেবল আট বছর নয়, আট হাজার মাইলের ওপারে সরে গেছে।

নীলাম্বরের মনে হ'ল বাড়ীতে তার সম্পর্কে একটা কথাও কেউ জিজ্ঞেস করেনি। সে কেমন ছিল, কোন্ জেলে কাটিয়েছে, কী করে তার মাথা জোড়া টাক পড়ল, এসব নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই। তার কথা এ বাড়ীর সবাই ভুলে গিয়েছে। মা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন মাঝে মাঝে বাড়ী থেকে চিঠিপত্র যেত। তারপর পাঁচ বছর আগে মা মরে গেলে—সবাই তাকে ভুলে গিয়েছিল।

আজ পীতাম্বরের চোখ দিয়ে জল পড়ছে, হঠাৎ মনে হয়েছে—তার জন্যে বুঝি এতদিন ভাবনায় ভাবনায় বৌদির রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয় নি? কী নিপুণ চমৎকার অভিনয়! আট বছর পরে ভাই ফিরে এলে চোখের জল ফেলা উচিত, দাদা তাই করেছে: বৌদির উচ্ছ্বসিত হওয়া দরকার, তাতে কোন ত্রুটি হয়নি। কিন্তু সে যদি না আসত? এ বাড়ীতে তাহলে কেউ তার কথা মনে করত না, এ বাড়ীর সে-যে কেউ এখনো ছিল তা-ও তো হয়তো মুছে যেত এখান থেকে!

কিন্তু কারো উপর রাগ করা চলে না। পরিবারের লজ্জা, বংশের কলঙ্ক একটা খুনীকে কে মনে রাখে? তবু তো একদিক থেকে অনেক ভালো বলতে হবে পীতাম্বরকে দরজা থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়নি।

কেন দিতে পারেনি? বাপের সম্পত্তিতে তারও দাবি আছে বলে?

সম্পত্তি! নিজের কাছেই চিন্তাটা এমন একটা রসিকতার মতো মনে হল যে একাই হেসে উঠল নীলাম্বর। তারপর অন্ধকার ঘর, গুমোট গরম, মশারির কোরা গন্ধ আর সারা শরীরের অপরিচ্ছন্ন গ্লানিকর খানিকটা অনুভূতি—ধীরে ধীরে তাকে একটা নির্বেদ শূন্যতার দিকে টানতে লাগল। আবার সেই প্রশ্নটা ফিরে এল মনের কাছে: কেন সে ফিরে এল এখানে? কি করবে সে এরপর?

সেই শূন্যতার ভেতরে নামতে নামতে যেন আকাশে হাত বাড়িয়ে

একটা কিছু সে ধরতে চাইল, কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু মশারিটার গন্ধ আর সেই গরম তাকে ঘিরে ঘিরে ঘন হতে লাগল, জড়িয়ে ধরল যেন ক্লোরোফর্মের নেশার মতো।

তারও পর—

তারও পরে সকাল।

মলিনা ডাকছিল, ওঠো—ওঠো ঠাকুরপো। আর কত ঘুমুবে?

এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল জেলখানার। শুনছিল পাহারার হাঁক—শুনছিল সেই লম্বা করিডোরটা দিয়ে জুতো মচমচিয়ে কে যেন হেঁটে আসছে। তার পরেই, হঠাৎ পাগলা ঘন্টির আওয়াজ, কে যেন চিৎকার করছিল ঃ বাইশ নম্বর ভাগ গিয়া—

ধক্ করে একটা ঘা লেগেছিল হৃৎপিণ্ডে। সে-ই তো বাইশ নম্বর।

চমকে চেয়ে দেখল, মাথার সামনেকার খোলা জানালা দিয়ে রোদ পড়েছে ঘরে। হাওয়ার কাঁপন লাগা মশারির ভেতর দিয়ে সেই রোদ কাঁপছে তারও গায়ে। টিপয়টার ওপরে এক পেয়ালা চা রেখে দাঁড়িয়ে আছে মলিনা। ডাকছে ঃ ওঠো ঠাকুরপো, ওঠো—বেলা তো ন'টা বাজল।

ন'টা!

মশারি তুলে বেরিয়ে এল নীলাম্বর! চোখ রগড়ালো দু'হাতে।

ন'টা!

মলিনা হাসল। নীলাম্বর দেখল, বৌদির মুখখানা গোল আর ভারী হয়ে গেছে, চর্বি জমেছে গলার নীচে, দু'টো দাঁত পড়ে গেছে ওপরের পাটি থেকে। আশ্চর্য, বৌদির রূপের খ্যাতি ছিল এক সময়।

মলিনা আবার বললে, এর আগে আরো দু'বার আমি চা এনেছিলুম। ডেকেও গেছি।

বিছানায় বসেই চায়ে চুমুক দিলে নীলাম্বর। মলিনা বললে, হাত মুখ ধুয়ে নাও, খাবার দিচ্ছি।

—দাদা কোথায় ?

—একটু কাজে বেরিয়েছে। আসবে খানিক বাদেই।

—দাদার স্কুল নেই ?

—স্কুল না থাকলে চলবে কি করে ? স্কুল টিউশনি দুই আছে। কিন্তু আজ তো রবিবার।

একটা চায়ের পাতা মুখে পড়তে নীলাম্বরের খেয়াল হল, চায়ের তলানি পর্যন্ত চুমুক দিয়েছে। পেয়ালার তলায় চায়ের পাতা থাকলে মানুষ নাকি ভাগ্যবান হয়, এমনি একটা কথা কবে কার মুখে যেন শুনেছিল সে। ভাগ্য—সন্দেহ কী। আট বছর পরে যে খুনী আসামী ঘরে ফিরেছে—কে জানে আজ কোন্ ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে।

মলিনা আবার বললে, তোমার দাদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার হয়েছে, জানো তো ? ওদের কি একটা শলাপরামর্শের জন্যে ডেকে নিয়ে গেছে।

নীলাম্বর কিছুক্ষণ ফাঁকা দৃষ্টিতে সামনের দেওয়ালটার দিকে চেয়ে রইল। দেওয়ালের গায়ে একটা কুমিরের চামড়া ঝুলছে—এইটে নতুন। গলার কাছে দু'টো বুলেটের দাগ দেখা যাচ্ছে এখনো। এইটে কাল রাতে তার চোখে পড়েনি, হঠাৎ তার মনে হল, ওই চামড়াটার সঙ্গে তারও কোথায় কী যেন সাদৃশ্য আছে। কে যেন তাকে অমনি করে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে। আর—আর হঠাৎ নীলাম্বর বললেঃ বৌদি, আমি না এলেই বোধ হয় ভাল করতুম—না ?

মলিনা যেন চমকে উঠল।

—ছি ছি, এসব কথা বলছ কেন ?

—দাদা একজন মানী লোক। তাঁর ছোট ভাই খুনের আসামী হয়ে জেল খেটে এসেছে, তাতে করে গ্রামে দাদার—

মলিনা থামিয়ে দিলে কথাটা। বললে, কী বলছ পাগলের মতো ?

সে সব তো কবেই চুকে বুকে গেছে। ওসব ভাবতে হবে না এখন। যাও তো—মুখহাত ধুয়ে এসো।

একটা নিঃশ্বাস ফেলল নীলাম্বর। ঝুঁকে পড়ে তক্তপোশের নীচ থেকে বের করে আনল একটা বিমান কোম্পানির নাম লেখা সবুজ প্লাসটিকের ব্যাগ। কলকাতার ফুটপাথ থেকে কিনেছিল। তা থেকে টেনে খুলল মুখ ধোয়ার সরঞ্জাম, লুঙ্গি, একটা নতুন গেঞ্জি। তার যা কিছু সঞ্চয়।

—পুকুরে আগে ভালো করে স্নান করব বৌদি।

—স্নান? এই সাতসকালে?

—হাঁ। শরীরটা বড্ড জ্বালা করছে।

তাই বটে। প্রত্যেকটা রোমকূপে যেন আগুনের কণা জ্বলছে তার। কাল রাতে নদীর জল সে জ্বালা খানিকটা জুড়িয়েছিল, আজ ঘুম থেকে উঠে আবার যেন সেই আগুন ফুটে উঠেছে রক্তের ভেতর থেকে, নিজেকে কুৎসিত রকমের ক্লিন্ন বলে বোধ হচ্ছে।

একটু পরেই গামছা নিয়ে খিড়কির ঘাটে পৌঁছুল নীলাম্বর।

শরতের ভরা পুকুর। কাঠফেলা ঘাটলার ধার দিয়ে কলমীর নীল নীল ফুল ফুটেছে, মাথা তুলেছে শাপলা শালুক। হাওয়া দিচ্ছে —জলে ঢেউ উঠছে অল্প অল্প। পুকুরের পাড়ে বাবলা গাছ থেকে একটা বুলবুল ডেকে উঠল। ওপর দিয়ে চিল উড়ছে ঘুরে ঘুরে, পুকুরের জলে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে তার ছায়া। শ্যাওলা পড়া ঘাটে বসে জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল নীলাম্বর, কয়েকটা ছোট ছোট মাছ এসে মাঝে মাঝে টুকটুক করে তার পা ঠুকরে যেতে লাগল। এই ঘাটলার পাশ থেকে এক সময় সে শুধু হাতে খপ খপ করে কাঁকড়া ধরত, মনে পড়ে গেল সে সব কথা।

সেই তখন, তার পাশে কাঁপা কাঁপা জলের ওপর যেন কার ছায়া পড়ল। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে। বৌদি? নীলাম্বর মাথা ঘুরিয়ে দেখল, বৌদি নয়। সাদা থান পরা একটি মেয়ে।

তার হাতে কতগুলো লাউকুমড়োর ডগা। পেছন ফিরে চাইতে গিয়ে সূর্যটা সোজা পড়ল নীলাম্বরের মুখে। চোখে ধাঁধা লাগল, কিছুক্ষণ সব এলোমেলো হয়ে গেল। তারপরে মনে পড়ে গেল মেয়েটি পদ্ম।

কিন্তু পদ্ম বিধবা!

তার চাইতেও আশ্চর্য হল পদ্ম। ভয় আর কৌতূহলে মিশে একটা অদ্ভুত স্বর বেরিয়ে এল তার গলা দিয়েঃ কে—কে তুমি? নীলুদা?

—হাঁ, আমি নীলাম্বর।—নীলাম্বর মুখে একটু বিস্বাদ হাসি ফুটিয়ে আস্তে আস্তে বললে, খুনী আসামী। জেল থেকে বেরিয়ে কাল রাতে বাড়ি ফিরে এসেছি।

নীলাম্বরের পাশে, ঘাটলার ধারে, জলের ওপর ছায়াটা কেঁপে উঠল আর একবার। ঢেউ লেগে যতটা কাঁপা উচিত তার চাইতে অনেক বেশী।

হাত বাড়িয়ে জল থেকে একটা নীল কলমীর ফুল তুলে নিলে নীলাম্বর। টুকরো টুকরো করে সেটাকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে নীরস ব্যঙ্গের স্বরে আবার জিজ্ঞেস করলঃ ভয় পেলে পদ্ম?

—না। ভয় পাব কেন?

॥ তিন ॥

আবার কিছুক্ষণ জলের দিকে চেয়ে রইল নীলাম্বর। হাওয়া দিয়েছে অল্প অল্প, কলমীর নীল ফুল কাঁপছে, পুকুরের ডান দিকের কোণটায় জলের ভেতরে যেখানে একগুচ্ছ নলঘাস উঠেছে—সেখানে উড়ন্ত ফড়িঙের পাখায় যেন সোনালি অভ্রের কুচি চিকচিক করছে। কী একটা মাছ বোধ হয় ফড়িং ধরবার জন্যেই লাফিয়ে উঠল সেখানে, মনে হল বোয়াল। পুকুরে যদি বোয়াল পড়ে থাকে, তা হলে পোনা মাছ একটাও আর রাখবে না।

পদ্ম তখনো ঘাটের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, নীলাম্বরের পাশেই জলের ভেতরে কাঁপছে তার ছায়াটা। পদ্মই আবার আস্তে আস্তে বললে, মাথার চুলগুলো কোথায় গেল নীলুদা? একেবারে যে টাক পড়ে গেছে!

নীলাম্বর হাসল।

—মেঘের আড়ালে আড়ালে বেলা তো আর নেহাত কম হয় নি! বেয়াল্লিশ বছর পার হয়ে গেল।

—তাইতেই কি এমন করে বুড়িয়ে যেতে হয়?

—শুধু সেজন্যে নয়। জেলখানার দিনগুলোও খুব সুখে কাটেনি।

পদ্ম নীচে গেল, মুখের ওপর ছায়া পড়ল তার। আস্তে আস্তে বললে, যা হয়ে গেছে সে কথা ছেড়ে দাও। এখন দিনকয়েক ভালো করে খাও দাও, শরীরটাকে ভালো করে ফেলো।

নীলাম্বর পদ্মর মুখের দিকে তাকালো! এতক্ষণে খেয়াল হল, তারও বয়েস হয়েছে, গোল আর ভারী হয়েছে শরীর, সাদা সিঁথেটা চকচক করছে, রুক্ষ লালচে চুলের কয়েকটা ঝুরো উড়ছে পাশে পাশে, চোখের কোণায় ছায়ার মতো একরাশ ক্লান্তি থমকে রয়েছে। পদ্ম

বিধবা হয়েছে। সেও কি সহজভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছে জীবনের সঙ্গে—ভুলে গেছে তার স্বামীর কথা, খেয়ে দেয়ে পরম সুখে আছে?

পদ্ম চোখ নামিয়ে নিলে। বললে, এক সময় যেয়ো আমাদের বাড়ীতে।

—যাব।

ছায়াটা নীলাম্বরের ছায়াকে ছুঁয়ে, পার হয়ে, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে গেল।

পায়ে ছোট মাছগুলো সমানে ঠুকরে চলেছিল। নীলাম্বর জলে নামল এতক্ষণে। নীচে তাল তাল নরম কাদা, বাসন মাজার ছাই জমে জমে পুকুরটা ময়লা হয়ে গেছে। আগে এরকম ছিল না। নীলাম্বরের বিরক্তি বোধ হল, দাদার মাঝে মাঝে পুকুর সাফ করানো উচিত। জলে ডুব দিয়ে আঁজলা ভরে সে কাদা তুলল খানিকটা, উঠল কয়লার কুচি, মাছের আঁশ, গুগলির খোল!

কাদাটা ডাঙায় ছুঁড়ে দিতে গিয়ে ডান হাতের তালুতে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা বোধ হল একটা। মাছের কাঁটা বিঁধেছে হাতে। কাঁটাটা টেনে খুলে ফেলতে এক বিন্দু রক্ত দেখা দিল।

রক্ত! স্ট্রেচারের পর স্ট্রেচার আসছে। মানুষের ছিন্নভিন্ন শরীর। স্ট্রেচার লাল, মিলিটারী পোশাকগুলো লাল, হাসপাতালের অপারেশনের টেবিল লালে লাল। তারপর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—

হাতের রক্তের বিন্দুটা বড়ো হয়ে গড়িয়ে চলেছে। জলের সঙ্গে মিশে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। চিনচিন করে যন্ত্রণা। একবার শিউরে উঠল নীলাম্বর, তারপর পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

রাত্রির সেই নদীটা নয়, সেই বুক জুড়িয়ে দেওয়া শীতল ভালবাসা নয়; শরতে পুকুরটা টই-টম্বুর হয়ে আছে, তবু জলটা গরম—কাদার অস্পষ্ট গন্ধ। অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে যখন ঘাটলায় উঠে এল তখনো সর্বাঙ্গে একটা গ্লানির অনুভব। বিষাদ ক্লান্তিতে নীলাম্বরের মনে হল, পেছনের একটা দীর্ঘ জীবনের কাছ থেকে যে যন্ত্রণা, যে

অবসাদ সে নিজের ভেতর বয়ে এনেছে—সহজে সে তার সঙ্গ ছাড়বে না। তার মুক্তিস্নানের এখনো অনেক দেরী আছে, এখনো অনেকদিন পর্যন্ত নিজের অপচ্ছায়ার কাছ থেকে তার পরিত্রাণ নেই!

হাতের তালুতে রক্তের বিন্দুটা আর নেই, কাদার গন্ধভরা পুকুরের নোংরা জলে তা ধুয়ে গেছে। কিন্তু যন্ত্রণাটা এখনো বিঁধে আছে সেখানে। নীলাম্বরের মনে হতে লাগল এই যন্ত্রণাটার একটা মানে আছে।

একটা অপরিচ্ছন্ন পুকুর থেকে সে এক আঁজলা কাদা তুলতে চেয়েছিল, অনেকখানি নিবিড় শীতল জলের ভেতর ডুবে থাকতে চেয়েছিল, মাথার শিরাগুলোতে কতদিন ধরে আগুনের কণা জ্বলছে—ভেবেছিল এইখানে এসে ধীরে ধীরে নিবে যাবে। কিন্তু!

হাতের তালুর এই যন্ত্রণা। এর একটা মানে আছে কোথাও।

স্নান শেষ করে যখন বাড়ীতে পা দিল, তখন পীতাম্বর ফিরে এসেছে। তেমনি তামাক টানছে দাওয়ায় বসে। দিনের আলোয় চোখে পড়ল দাদার চুল অর্ধেকেরও বেশী সাদা, কপালে কয়েকটা ভাঁজ স্থির আর স্থায়ী হয়ে আছে, একটা দুশ্চিন্তার ছায়া থমকে আছে মুখের ওপর?

দুশ্চিন্তা? তার জন্যেই? নীলাম্বর দাঁড়িয়ে পড়ল।

পীতাম্বর চোখ তুলে চাইল।

—কিরে, এই সকালেই চান করে এলি? তা পুকুরে গেলি কেন? ওর জল তো খারাপ হয়ে গেছে।

নীলাম্বর আবছাভাবে হাসল: অনেকদিন পুকুরে স্নান করিনি।

—দত্তবাড়ীর দীঘিতে গেলেই পারতিস। অনেকেই চান করে সেখানে।

দত্তবাড়ীর দীঘি। আর একটা স্মৃতি। ছেলেবেলার কতগুলো দিন কেটেছে তার জল তোলপাড় করে। দত্তেরা কতদিন দেশছাড়া, তিনমহলা পোড়ো বাড়ীতে জঙ্গল আর সাপের আস্তানা—কিন্তু দীঘির

জল নীল আকাশের মতো ছলছলে। পদ্ম। ওই দীঘিতেই সে পদ্মকে সাঁতার শিখিয়েছিল।

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, কবে পদ্মর বিয়ে হয়েছিল, কবেই বা বিধবা হয়েছে সে। কিন্তু জিজ্ঞেস করা হল না। রান্নাঘর থেকে মলিনা ডাকল, ঠাকুরপো, তোমার দাদা মাছ নিয়ে এসেছে দেখে যাও।

পীতাম্বরের মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল একটুকরো : দেখে আয়।

রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে নীলাম্বর দেখল, সের চারেক ওজনের বিরাট এক চিতল মাছ। দাদার মেয়ে শৈলী একটা ঝিনুক ঘষে ঘষে তার আঁশ পরিষ্কার করছে।

মলিনা হেসে বললে, মহানন্দার মাছ।

—হুঁ, চমৎকার।

নীলাম্বর ফিরে এল। পীতাম্বর একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বললে, বোস এখানে।

আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টেনে চলল পীতাম্বর। নীলাম্বর ভাবতে লাগল, সে বাড়ী ফিরেছে বলে তারই সম্মানে এত বড় মাছটা আজ কিনে আনা হয়েছে। কিন্তু এই পোষাকী ভদ্রতা, এই আপ্যায়নের পালা কতদিন চলবে? বারো বছর পরে সে বাড়ী ফিরেছে, কিছুদিন ধরে অতিথির আদর চলতে থাকবে, তারপর অতিথি একদিন ভার হয়ে উঠবে, একটা জেলফেরত অকর্মণ্য মানুষের বোঝা সংসারের পাকে অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন—

পীতাম্বর হুঁকোটা নামিয়ে রাখল। কী দিয়ে কথা আরম্ভ করবে তাই ভাবতে লাগল খুব সম্ভব।

নীলাম্বর দেখল, পাঁচিলের কাছে পুরোনো শিউলি গাছটার তলা ঝরা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। রান্নাঘরের পাশে পেঁপে গাছটা থেকে একটা শুকনো পাতা হলদে হয়ে খসে পড়ল। পাঁচিলের ওপর দিয়ে

ছুটো কাঠবেড়ালী দৌড়ে যাচ্ছে। বাইরে বাবলা গাছে বুলবুলি শিস দিচ্ছে এখনো। আকাশ উজ্জ্বল নীল—টুকরো টুকরো শাদা মেঘের আসা যাওয়া চলছে।

নীলাম্বর একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, দাদা।

—কী বলছিস?

—এখন আমি কী করব?

পীতাম্বর চেয়ে রইল ওর দিকে। যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না।

—কিছু একটা কাজ-টাজ পাওয়া যায় না?

—কাজ! এই গ্রামে!—পীতাম্বর একটু থামল, যেন সে কথাটা বলতে চাইছিল—তার মোড় ঘুরিয়ে নিলে। বললে, কাজের জন্যে তাড়া কী! দিনকয়েক বিশ্রাম-টিশ্রাম কর—

নীলাম্বর হাসল: জেলে আমি আট বছর বিশ্রাম করেছি দাদা, আর দরকার নেই।

পীতাম্বর থমকে গেল। এই কথাটাই প্রাণপণে ভুলে থাকতে চায় সে, নইলে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত তার সাহস হয় না। মিলিটারী থেকে বেরিয়ে এসে ভাই কলকাতায় কিভাবে দিন কাটাচ্ছিল, সে খবর তার অজানা ছিল না। একটা কারখানায় কাজ নিয়েছিল, কিন্তু মদে এবং—! সেদিন অনেকবার ভাইকে সে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল, বলেছিল, দরকার নেই এখানে চাকরি করে, বাড়ী ফিরে চল্। তোর ওপর আমাদের অনেক আশা-ভরসা ছিল, তোর জন্যেই কাঁদতে কাঁদতে মা মরে গেছে—তুই কোনোদিকে চেয়ে দেখিস নি। অনেক তো হল, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আয়। জমি-জমা সামান্য যা আছে দেখবি, আমার স্কুলে নয় একটা চাকরি করে দেব—কিন্তু নীলাম্বর সেদিন কোনো কথায় কান দেয় নি। বলেছিল, 'আমি কলকাতা ছেড়ে থাকতে পারব না।'

তারপর সেই বীভৎস খুনের মামলা। ছুটে গিয়েছিল পীতাম্বর—বিশ্বাস করতে পারে নি। কিন্তু মামলায় কোনো গোলমাল ছিল না। একই মদের গ্লাসের সঙ্গী—মাঝখানে একটা নষ্ট মেয়ে—রেশারেশি, তারপর—

তারপর আসামীর কাঠগড়ায় নিজের ভাইকে সে দেখতে পেয়েছিল। একটা অদ্ভুত অপরিচিত চেহারা, মুখের ওপর কে যেন বিকৃতির মুখোস পরিয়ে দিয়েছে, অস্বাভাবিক চাউনি, খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি আর বিশৃঙ্খল বুনো চুলে নির্ভুল এক খুনীর মূর্তি। স্কুল-মাস্টার নিরীহ ভদ্রলোক পীতাম্বর নন্দী নিজের ভাইকে চিনতে পারে নি—শুধু মনে হয়েছিল কে এই লোকটা, কোন্ একটা ফাঁসির আসামীকে বাঁচাবার জন্যে অকারণে সে এমনভাবে কলকাতায় ছুটে এসেছে।

তবু উকিল দিতে হয়েছিল, তবু মামলা চালাতে হয়েছিল। ফাঁসি হয়নি এইজন্যেই যে খুন হওয়া জগু গোঁসাইও লোক নেহাৎ মহৎ ছিল না, আর মদের মাথায় ছুরি বের করে হঠাৎ—

আর সেই নষ্ট মেয়েটা! কী নির্লজ্জভাবেই মামলার সাক্ষী দিয়েছিল! কী বীভৎস একটা ইতিহাস সে মেলে ধরেছিল আদালতের সামনে। পীতাম্বরের মনে হয়েছিল আদালতের ঘরটা যেন একটা লাটিমের মতো ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে, একটু পরেই কাত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে!

উকিল বলেছিলেন, ধর্মাবতার, আসামীর দিকটা বিবেচনা করে দেখতে বলি। ভদ্রঘরের ছেলে, ভালো ছাত্র—কিন্তু তার এই পরিণামের জন্যে সে কি একাই দায়ী? আপনারা জানেন, আসামী যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, এয়ার ফোর্সে ছিল। যুদ্ধের অভিশাপে সে মনুষ্যত্ব হারালো, নেশা ধরল, মিলিটারী ডিসিপ্লিন ভেঙে কোর্ট মার্শাল হয়ে তার চাকরি গেল। কিন্তু যে বিকৃত জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তার হাত থেকে—

পরের অংশটুকু আর মনে করতে পারে না পীতাম্বর। ঘুরন্ত লাটিমটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল, আদালতের বেঞ্চিতে জ্ঞান হারিয়েছিল সে।

তারপর এই আট বছর। মিথ্যে নয়—এই আট বছর ধরে সে একান্তভাবে কামনা করেছে নীলাম্বর যেন আর ফিরে না আসে—যেন চিরদিনের মতো যুদ্ধে যায় সে। তবু নীলাম্বর ফিরে এল। আর কাল সারা রাত ধরে পীতাম্বরের প্রত্যেকটি নিদ্রাহীন মুহূর্ত শুধু একটি কথাই ভেবেছে: এরপর? এরপর?

সমস্ত চেষ্টা দিয়ে পীতাম্বর অতীতটাকে ভুলতে চেয়েছে, চেয়েছে তার ছোট ভাই আবার সহজ হয়ে সেই পুরোনো দিনগুলোতে ফিরে আসুক। সেই স্পোর্টস্‌ম্যান—সেই ঝকঝকে স্বাস্থ্য, গ্রামের স্কুলের সেই সেরা ছাত্র, বাবার সেই স্বপ্ন: আমার ছেলে আই-সি-এস্ হবে। নীলাম্বর যদি মরে যেত, যদি তার ফাঁসি হয়ে যেত—তা হলে স্মৃতিটাকে ওইখানে থামিয়ে রেখেই একরকম করে ভুলে থাকতে পারত পীতাম্বর। কিন্তু—

এক মিনিট—দু মিনিট—তিন মিনিট—এরই মধ্যে এতগুলো কথা পীতাম্বরের মনের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আর নীলাম্বর দেখতে লাগল, পাঁচিলের ওপর দিয়ে কাঠবেড়ালীরা ছুটে বেড়াচ্ছে, পেঁপে গাছের শুকনো পাতা ঝরছে, শিউলি গাছটার তলায় ফুলগুলো শাদা হয়ে আছে আর উজ্জ্বল নীল আকাশ বেয়ে এক ঝাঁক পায়রা রৌদ্র-স্নান করতে করতে উড়ে চলেছে।

নীলাম্বর আবার বললে, আমাকে দিয়ে কোনো কাজই কি হয় না দাদা?

—হবে, হবে, ব্যস্ত কেন? সবে তো কালই এসেছিস। পীতাম্বর কথাটাকে যেন জোর করে চাপা দিতে চেষ্টা করল: এই পঞ্চায়েত নিয়ে কী ঝঞ্ঝাটেই যে পড়েছি! খামোকা লোকের সঙ্গে শত্রুতা বেড়ে যায়। এর চাইতে আগেকার আদালত কাছারীই ছিল ঢের

ভালো—উকিল-মোক্তার-হাকিমে মিলে যা খুশি করত, আমাদের কোনো ভাবনা ছিল না!

রান্নাঘর থেকে মলিনা বেরিয়ে এল। থালায় করে লুচি আর হালুয়া নিয়ে এসেছে। নীলাম্বরের সামনে রেখে বললে, খাও ঠাকুরপো।

—একি! এসব কেন?

—বা-রে, জলখাবার খেতে হবে না? মলিনা হাসল। মুখের একেবারে সামনে থেকে একটা দাঁত পড়ে গেছে, সেই কারণেই কিনা কে জানে, হাসিটাকে কেমন কৃত্রিম মনে হল নীলাম্বরের।

—তাই বলে লুচি-হালুয়া কেন? জেলে থেকে এ-সব অনেকদিন ভুলে গেছি।

পীতাম্বর একটুখানি নড়ে বসল, হাসিটা যেন এক মুহূর্তের জন্যে মলিনার মুখে জমাট হয়ে রইল।

—কথা বাড়াতে হবে না ঠাকুরপো, খাও।

—দাদা?

পীতাম্বর বললে, আমার আবার অম্বলের গোলমাল আছে, ও-সব ঘি-টির জিনিস সহ্য হয় না। আমার বরাদ্দ চিঁড়ে-দুধ। তুই খা।

লুচি ছিঁড়তে ছিঁড়তে নীলাম্বরের আবার মনে হল, অতিথির আপ্যায়ন চলছে। কিন্তু কতদিন চলবে এইভাবে? অতিথি যখন শেষ পর্যন্ত ভার হয়ে উঠবে, তখন?

বাইরে থেকে দরাজ মোটা গলায় ডাক এল: নন্দীমশাই, ও নন্দীমশাই।

পীতাম্বর সাড়া দিয়ে বললে, কে?

—আমি অমর। অমর বোস।

মলিনার ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা বিকৃত শব্দ ছিটকে পড়ল: দারোগা!

আসনে শক্ত হয়ে গেল পীতাম্বর। লুচির টুকরোটা মুখে তুলতে

যাচ্ছিল নীলাম্বর—সেটা শূন্যে থমকে দাঁড়ালো। একবার দাদা, একবার বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে শুকনো বিস্বাদ হাসিতে নীলাম্বর বললে, ভয় নেই বৌদি, জেল থেকে বেরিয়ে আর একটা খুন আমি করিনি।

পীতাম্বর আগে সামলে নিলে। বললে, কী বকছিস পাগলের মতো? দারোগা আমাদের—মানে খুব আপনার লোক—মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যায়।—তারপর গলা চড়িয়ে বললে, বাইরের ঘরে বসুন অমরবাবু, আমি আসছি।

পীতাম্বর বেরিয়ে গেল। নীলাম্বর দেখল, তার ভাইঝি শৈলী রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে তারই দিকে চেয়ে আছে, তার দু চোখে পৃথিবীর যত ভয় এসে যেন জড়ো হয়েছে। পীতাম্বরের ঘরের ভেতর থেকে ভাইপো দু'জনের পড়ার আওয়াজ আসছিল, থেমে গেছে তারা। আর মলিনার মুখের রঙ যেন বহুরূপীর মতো বদলাচ্ছে ঘন ঘন।

মলিনা বললে, খাও ঠাকুরপো।

লুচি হালুয়ার তালটা গলায় গিয়ে আটকালো, যেন একতাল লোহা গিলছে নীলাম্বর। তারপর একগ্লাস জল শেষ করে নীলাম্বর বললে, বৌদি, আর পারছি না।

—কিছুই তো খেলে না ঠাকুরপো।

—কাল রাত্রের খিচুড়ি এখনো জমে আছে বৌদি, খিদে নেই।

এমন সময় বাইরের ঘর থেকে পীতাম্বরের ডাক এল: শৈলী, তোর কাকার খাওয়া হলে একবার বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দিস। দারোগাবাবু আলাপ করবেন।

শৈলীর চোখে আবার পৃথিবীর সমস্ত ভয় চমক দিয়ে উঠল, বদলে গেল মলিনার মুখের রঙ। মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে যখন হাতের তালুতে যন্ত্রণাটা শিউরে উঠল, তখন হঠাৎ যেন নীলাম্বর বুঝতে পারল ওই যন্ত্রণাটার অর্থ কী।

॥ চার ॥

দারোগা অবশ্য অন্য কারণে ডাকেননি। এলাকার অন্যান্য দাগী আসামীদের মতো সপ্তাহে একদিন করে থানায় হাজিরা দেবার কথাও বলেননি নীলাম্বরকে। আসলে পীতাম্বরের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা আছে, নিয়মিত যাওয়া-আসা করেন, সেই সূত্রেই একটু আলাপ করে নেওয়া —এই আর কি।

হাসিমুখেই সেই আলাপটুকু করলেন দারোগা। দেশের কথা তুললেন। জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে গেছে তা ঠিক, ট্যাক্স্‌ও বাড়ছে। কিন্তু কি করা যায় বলুন। দেশটাকে ইংরেজ তো একেবারে শুষে ফোঁপরা করে রেখে গিয়েছিল। নতুন করে গড়ে তুলতে চাইলে অনেক টাকা দরকার—আমরা যদি না দিই, সে টাকা কোথা থেকে আসবে। দেখুন না, এই ক' বছরেই সব পালটে গেছে ম্যাজিকের মতো। কত হাসপাতাল, কত স্কুল, কত প্রজেক্ট, কত নতুন রাস্তা, গ্রামে গ্রামে ইলেক্‌ট্রিকের আলো। দামোদরের কল্যাণে, ময়ূরাক্ষীর প্রকল্পে কত রুক্ষ মাটি রসে ভরে উঠবে এবার—সোনা ফলবে দিকে দিকে। অবশ্য মানুষের সব চাহিদা মেটাতে সময় একটু লাগবেই—রাতারাতি তো আর—

দারোগা বলে চললেন, পীতাম্বর সায় দিতে লাগল, কথা জুড়ে চলল সঙ্গে সঙ্গে। আর নীলাম্বর বসে রইল অন্যমনস্ক হয়ে। সামনে যতদূর চোখ যায় ফসলকাটা মাঠ, এখানে ওখানে দুটো একটা টিলা—তাদের ওপরে কাঁটাগাছের জঙ্গল, কিছু তালগাছ, এক একটি ছায়া-কুঞ্জের মতো আম-কাঁঠাল-তেঁতুল-নিমের আড়ালে ছাড়া-ছাড়া গ্রাম। অবসন্ন রোদের মধ্যে সব মগ্ন হয়ে আছে, সব যেন নীলাম্বরের মতো ক্লান্ত, আড়ষ্ট, প্রৌঢ়—যা কিছু প্রয়োজন ছিল সমস্ত মিটিয়ে দিয়ে নিঃসাড়ে এলিয়ে পড়েছে।

এই বিশ্রান্ত রোদ—ঘরের কোণে কোথায় একটা ভ্রমরের একটানা গুনগুনানি, মাঠের পথ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলা ভাঙা-ছইয়ের একটা গোরুর গাড়ী, সব একসঙ্গে মিলে হলুদ রঙের পটে আঁকা ছবির মতো স্থির হয়ে রইল নীলাম্বরের চোখের সামনে, তারপর একাকার হয়ে একটু একটু দুলতে লাগল, তারও পরে কেমন যেন ঝিম ধরল তার। আর একটু হলেই ওই সামনের মাঠটার মতোই নীলাম্বর ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু দারোগার সম্ভাষণে তার চমক ভাঙল।

—তারপর, কী করবেন ঠিক করলেন ?

নীলাম্বর সোজা হয়ে উঠে বসল। সেই এক প্রশ্ন। পরশু রাতে ট্রেনে ওঠা পর্যন্ত তার মাথার ভেতরে সমানে ঘুরপাক খাচ্ছে। এখনো তার উত্তর মেলেনি।

—দেখি।

পথ দারোগাই দেখিয়ে দিলেন : কংগ্রেসের কাজ-টাজ কিছু করুন না।

—আমি !—নীলাম্বর চমকে উঠল : আমি কংগ্রেসের কাজ করব ?

দারোগার মুখে একটা ছায়া পড়ল চকিতের জন্যে : কেন—আপনার আপত্তি আছে নাকি ? আই মীন, আপনি কি—ইয়ে—মানে কোন লেফটিস্ট—

নীলাম্বর ক্লান্তমনে হাসল : আমি ওসব কিছু বুঝতে পারি না, কোনোদিন রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু আমি তো খুনী আসামী, কংগ্রেস কেন আমাকে বিশ্বাস করবে ?

পীতাম্বর ব্যস্ত হয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, দারোগা তাকে থামিয়ে দিলেন। জিভ কেটে বললেন ছিঃ—ছিঃ, ও-সমস্ত কথা কেন তুলছেন। অল্প বয়সে মানুষ—

—অল্প বয়েস। আমি চল্লিশ পেরিয়েছি, তা জানেন ?

—তা হোক, তা হোক। ভুল মানুষের সব সময়েই হতে পারে, শুধরে নেওয়াটাও তারই হাত।

—কিন্তু কেউ আমায় বিশ্বাস করবে না।

—করবে, করবে—সবাই করবে! না করে আমরা তো আছি।

নীলাম্বর এত দুঃখেও হেসে ফেলল: ভয় দেখিয়ে বিশ্বাস করাবেন?

—আরে না-না, তা বলছি না। দারোগা একটু লজ্জিত হলেন: মানে, কথাটা কী জানেন? এভাবে বসে থেকে তো আর সত্যিই কোনো লাভ নেই। ভুল যদি কিছু করেই থাকেন, তা হলে দেশের কাজের ভেতর দিয়েই তার প্রায়শ্চিত্ত করুন। তাতে আপনারও ভালো হবে—দেশেরও উপকার হবে।

—দেখি।

দারোগা উঠে দাঁড়ালেন: আচ্ছা, চলি আজকে। পরে আসা যাবে আবার। আর সময় পেলে মাঝে মাঝে থানায় পায়ের ধুলো দেবেন নীলাম্বরবাবু, এক আধটু গল্প করা যাবে। আপনার দাদা আমার বিশেষ বন্ধু।

নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন দারোগা—নীলাম্বর দেখল সেই ঝিমধরা রোদের ভেতর—ঘুমন্ত মাঠের পথ ধরে সাইকেল চালিয়ে কোথায় চলেছেন ভদ্রলোক, সেই হলুদ পটের ভেতর তাঁর খাকী রঙের পোষাক মিলে এক হয়ে গেছে।

কিন্তু কথাটা সারাদিন ধরে মনের ভেতর বাজতে থাকল।

সত্যিই তো—ভালো কাজের ভেতর দিয়েই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। কিন্তু ভালো কিছু করবার মতো শক্তি আছে তার—আছে মনের জোর? নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল একরাশ অর্থহীন শূন্যতা জমাট বেঁধে আছে—কোনো একটা জিনিস বেশিক্ষণ একভাবে চিন্তা করবার মতো শক্তি পর্যন্ত তার নেই। কখনো কখনো মনে হয়, জেলে যাওয়ার আগেকার জীবনটা শুধু খানিক কল্পনার খেয়াল—ট্রেন থেকে নামবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে কেউ ছিল না—কোথাও ছিল না। তার ভবিষ্যৎটা যেমন ফাঁকি, অতীতটাও ঠিক সেই রকম মিথ্যে—মধ্যে মধ্যে যেন নিজের নামটাকে পর্যন্ত সে চিনতে পারে না।

এই অস্তিত্বহীন ফাঁকার ভেতরে এমনভাবে কতদিন বাঁচা যাবে? কতদিন এমনি করে টেনে চলতে পারবে নিজের ক্লান্তির ভার।

তার চেয়ে একটা কাজ করা তার দরকার। আরো কিছুদিন এমন ভাবে কাটালে এই শূন্যতার মাঝখানে সে একেবারেই হারিয়ে যাবে?

দেশের কাজ?

যে কোন কাজ একটা তার দরকার। নিজের মনের ফাঁকাটার দিকেই তাকানো যায় না। এই মাঠ—এই রোদ—এই অবসাদ। তলিয়ে যাব তার মধ্যে। এই চল্লিশ বছরেই?

: মীনিংলেস! এভরিথিং।

: মীনিংলেস? এই যুদ্ধটাও?

: নিশ্চয়। আই হেট ওয়ার।

: তবে এলে কেন?

: বিকজ আই হেটেড এভরিথিং অ্যারাউণ্ড মী? সো আই সিলেক্টেড দি মোস্ট হেটেড থিং।

কোথাও কিছু ফাঁক থাকবার জো নেই—এই হল প্রকৃতির নিয়ম। বিজ্ঞানের সূত্র। ফ্রণ্টে একটা ইউনিট মুছে গেলে আর একটা এসে সেখানে দাঁড়ায়। একজনের রক্তে চটচটে ট্রেঞ্চের কাদায় আর একজন এসে জায়গা নেয়।

ঝিমধরা রোদে এখানকার মাঠ আকাশ তালগাছ—সব অলস বিশ্রান্তিতে ঘুমিয়ে থাকতে পারে দিনের পর দিন; কিন্তু তার ভেতরে জন্ম-জীবন-মৃত্যুর ঢেউ ওঠে—ঢেউ ভাঙে; একটা গোরুর গাড়ী লাল ধুলো উড়িয়ে কোথায় যায়। হলুদ রঙের রোদে খাকী পোষাকপরা মানুষটা একাকার হয়ে যায়, সাইকেলের ধাতব অংশগুলো চিকচিক করে।

একটা কাজ তার চাই। দেশের কাজ? ক্ষতি কী।

বিকেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল নীলাম্বর।

সেই গ্রাম। আট দশ বছরে খুব বেশি বদলায় নি। পাকিস্তান হয়েছে—তবু এতদূর গ্রামের ভেতর উদ্বাস্তুর ঢেউ এসে পৌঁছোয় নি। প্রায় সব এক রকম। কেবল এখানে ওখানে দু-একটা নতুন বাড়ী উঠেছে, এদিকে যেখানে খানিকটা জলা-জংলা জায়গায় আগে নানা জাতের কেউটে থাকত, সেখানে ঝকঝকে একটা বাড়ী—বড়ো বড়ো অক্ষরে দেখা যায়—'স্বাস্থ্য কেন্দ্র।' স্কুলের জীর্ণ একতলাটার সেই চেহারা আর নেই—তার শ্রী ফিরেছে। পাশে মস্ত দোতলা দালান উঠেছে একটা। 'সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়।' শরৎ ঘোষের মুদীখানার দোকানটা বেড়েছে, তার আধখানা জুড়ে মনোহারী জিনিসপত্র—সাইনবোর্ডে লেখা আছে: 'স্কুলের বই এবং নাটক নভেল পাওয়া যায়।' ট্রাউজার পরা দুটি ছেলে শিস্ দিয়ে গেল পাশ দিয়ে—গ্রামের পক্ষে এই ছবিটাও নতুন।

মাঝে মাঝে চেনা মানুষ। আট বছরে যতখানি বদলানো দরকার। কারো চুল শাদা হয়ে এসেছে, কারো চুল পাতলা হয়ে গেছে, কেউ বা ভারী আর বয়স্ক হয়ে উঠেছে। সে গ্রামে ফিরেছে—এই খবরটা এর মধ্যে কারো আর অজানা নেই। সব চোখেই এক ধরনের জিজ্ঞাসা, এক কৌতূহল।

'ভালো আছো?'

'ভালো আছেন?'

'এখন থাকা হবে তো কিছুদিন?'

আর সব কিছুর ভিতরে সেই অনুচ্চারিত কথাটা: 'এই লোকটা খুন করেছিল—এই নীলাম্বর খুনী—এই নীলাম্বর নন্দী খুনী আসামী—জেল খেটে ফিরে এসেছে—'

পুরোনো কালীমন্দিরটার সামনে এসে নীলাম্বর দাঁড়িয়ে পড়ল। কে বলে, তার মনের ভেতরে শুধুই একটা ফাঁকা আকাশ—শুধু একটা ঘুমন্ত মাঠের ওপর রোদের মায়া ছড়ানো? এই অবসাদ শুধু একটা ক্ষতের যন্ত্রণার ওপরে খানিকটা মরফিয়ার আবরণ—সেটা সরে গেলেই—

নীলাম্বর দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা নিমগাছে পিঠ দিয়ে।

আবার চোখ ঝিমিয়ে আসে। আবার ঘুমের মধ্যে সর্বাঙ্গ এলিয়ে আসতে চায়। আঃ—সেই নদীটাকে যদি এখানে পাওয়া যেত! সেই আসবার রাতে যে নদীটা সে সাঁতার দিয়ে পার হয়েছিল, যার কালো স্রোতের ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় সমস্ত শরীর তার জুড়িয়ে গিয়েছিল!

—নীলুদা!

নীলাম্বর চোখ মেলল। সামনে পদ্ম।

—এখানে দাঁড়িয়ে নীলুদা?

নীলাম্বর সোজা হল। চেয়ে দেখল পদ্মর দিকে। হাতে সেই শাঁখের বোঝা আর নেই—এখন অন্য রকম। পরণে ফরসা থান, গায়ে শাদা ব্লাউজ। গলায় একটি সরু সোনার হার চিকচিক করছে।

—এমনি।

—মা-র মন্দিরে গিয়েছিলে?

না—নীলাম্বর হাসলঃ ওসবে আমার স্ুবিধে হয় না। তুমি কোত্থেকে?

বলেই মনে হল, এক সময় পদ্মকে সে 'তুই' বলে ডাকত। কিন্তু এখন অনেক বদলে গেছে। এখন আর অত অন্তরঙ্গ হওয়া যায় না।

পদ্ম মাথা নামালো। যেন লজ্জা পেল একটুখানি।

—পড়তে গিয়েছিলুম।

—পড়তে?

—হ্যাঁ, অ্যাডাল্‌ট এডুকেশনের ক্লাস হয় এখানে।

অ্যাডাল্‌ট এডুকেশন! নির্ভুলভাবে দুটো বড়ো বড়ো ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করল পদ্ম। অথচ এই গ্রামে মেয়েদের যে মাইনর স্কুল ছিল, যতদূর মনে পড়ছে, তার থ্রী কিংবা ফোরের পরে পদ্ম আর এগোয় নি।

ঠিক কথা—অনেক বদলে গেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়। অ্যাডাল্‌ট এডুকেশন। দুটি ছেলে যাচ্ছিল ট্রাউজার

পরে। চারদিকের জগৎটা যেন নতুন হয়ে উঠেছে। দারোগা সেই কথাই বলছিলেন—পীতাম্বর তাতে সায় দিচ্ছিল। অথচ কাল রাত্রে সেই পীতাম্বরই বলছিল, দিনকাল কী যে পড়েছে! মানুষের এত অভাব—

পদ্ম বললে, কী ভাবছ?

জায়গাটা নির্জন। পুরোনো কালীমন্দিরের চাতালে একটি মাঝ বয়েসী মেয়ে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। নীলাম্বর যেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটা একটা নিমগাছ। তার ছায়া কাঁপছে চারপাশে, পাতার আওয়াজ শোনা যায়।

নীলাম্বর বললে, কিছু না। কে পড়ায় তোমাদের?

—টীচার আছেন একজন।

—গ্রামের মেয়েরা আসে?

—আসে অনেকেই।

—খুব ভালো।

একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, লেখাপড়া শিখে পদ্ম কী করবে। দেশের কাজ? খুব সম্ভব।

—তুমি তো আমাদের ওখানে গেলে না নীলুদা।

—কাল যাব।

—আচ্ছা, আসি আমি এখন।

—এসো।

পদ্ম চলে গেল। পায়ে একটা শাদা রবারের চটি। এ-ও নতুন। সবাই জীবনকে বদলাতে চায়। সে-ও কেন বদলাবে না?

অনেকক্ষণ ধরে নীলাম্বর ঘুরে বেড়াল এদিক ওদিক। তারপর এক সময় ক্লান্ত পায়ে গিয়ে বসল মাঠের ভেতর। বেলা ডুবল, সন্ধ্যে হল, তারপর ভরা রাত এল। বাড়ী ফেরা দরকার।

কিন্তু আরো দেরী হল বাড়ী ফিরতে।

মাঠের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে পথ হারালো সে। দূর থেকে আম-

কাঁঠাল-তেঁতুলের ছায়ায় যে ছোট ছোট বাড়ীঘরগুলো দুপুরের রোদে হাতছানি দিচ্ছিল, রাতের অন্ধকারে তারাই কয়েকটা আলোর বিন্দু হয়ে ডাক পাঠালো।

দিক ভুল হয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে—নীলাম্বর ফিরে আসছিল। আচমকা তার পা থমকে দাঁড়ালো।

সামনেই একটা মাটির ঘর। কাঁচা হাতে লেখা কিসের একটা সাইনবোর্ড। ভেতরে মিটমিটে আলো।

কিন্তু সাইনবোর্ড পড়বার আগেই গন্ধ পেয়েছিল নীলাম্বর। যেমন করে বাঘ রক্তের গন্ধ পায়। আর তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত শূন্যতার ওপর বন্যার মতো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আদিম অন্ধকার।

একবার পকেটে হাত দিয়ে দেখল, কিছু পয়সা আছে সেখানে। আর একবার ভাবতে চাইল—এ সে করছে কী—এ যে সেই অপঘাতের পথ। সে তো দেশের কাজ করতে চেয়েছিল ?

কিন্তু সেই আদিম অন্ধকারটা তাকে কয়েক মুহূর্তের বেশি দাঁড়াতে দিল না। নীলাম্বর দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল তাড়ির দোকানে।

॥ পাঁচ ॥

—হেই, কে হে এখানে ?

প্রথমে মনে হল, অনেক চওড়া একটা নদীর ওপার থেকে এপারে কে কাকে ডাকছে। আর সেই নদীটার ঘাটে বাঁধা একটা নৌকোর ওপর শুয়ে আছে নীলাম্বর, জলের দোলায় নৌকোটা কাঁপছে অল্প অল্প—ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার সারা শরীরটা যেন কালিয়ে যাচ্ছে। নীলাম্বর হাঁটু দুটো বুকের কাছে টেনে এনে আরো উত্তপ্ত, আরো ঘনীভূত হতে চাইল।

সেই দূরের স্বরটা কাঁপতে কাঁপতে যেন অনেক বেশি কাছে চলে এল।

—নেশা করেছে হে, তাড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

—ভদ্রলোক মনে হচ্ছে যে! এই বাবু, ওঠো—! সাপে টাপে কামড়ে দেবে।

নৌকার দোলটা যেন থেমে গেছে, অনেক দূরের স্বরগুলো এখন তাকে ঘিরেই স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। নৌকোটাকে কারা যেন ডাঙায় তুলে ফেলল। মুখে চোখে যেন আগুনের ঝলক পড়ছে থেকে থেকে। নীলাম্বর চোখ মেলল।

প্রথমটায় সব আবছা। দু'জন অচেনা মানুষের অন্ধকার রেখা। একজনের হাতের টর্চ থেকে একরাশ ধারালো আলো এসে পড়ছে তার ওপর। পিঠের নীচে শক্ত মাটি, আশপাশে খানিক ঝোপ জঙ্গল : চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে, ওপরে ঠাণ্ডা কালো আকাশে এক ঝাঁক শীতল নক্ষত্র থরথর করে কেঁপে চলেছে মনে হল।

—ওঠো বাবু ওঠো! ছি-ছি, ভদ্রলোকের ছেলে!

অবশ মস্তিষ্কে বিদ্যুতের চমকানি। স্মৃতির তুচ্ছ বিন্দুগুলি একটু

একটু করে ফুটে উঠছে এতক্ষণের মগ্নতা থেকে। যেমন করে বানের জল নেমে গেলে ডুবো ডাঙাগুলো জেগে উঠতে থাকে।

তার নাম নীলাম্বর নন্দী। মাত্র তিন দিন হল গ্রামে ফিরেছে। বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছিল, পুরোনো কালীমন্দিরের সামনে দেখা হয়েছিল পদ্মর সঙ্গে, এলোমেলোভাবে ঘুরতে ঘুরতে মাঠে নেমে পড়েছিল, তারপর—

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল নীলাম্বর। জোরালো টর্চের আলো তখনো স্থির হয়ে আছে তার ওপর। নিজেকে এইবারে ভালো করে দেখল সে। ধানখেতের একটা আলের পাশে পড়ে ছিল এতক্ষণ। কোথাও আধ শুকনো কাদা ছিল খানিকটা, জামা-কাপড়ে লেগে গেছে। ডান হাতে কয়েকটা বন্টিকারীর কাঁটা বিঁধেছে মনে হচ্ছে—জ্বালা করছে। তাড়ির জের এখনো কাটেনি—ঝিমঝিম করছে মাথাটা।

টর্চ হাতে লোকটা আবার বললে, আঁধার মাঠের মাঝখানে পড়ে রয়েছো, ভাবলাম খুন-জখম কিছু একটা হবে। কাছে আসতে তাড়ির গন্ধ নাকে এল, দেখি জব্বর রকমের টেনে পড়ে আছো এখানে। কোথাকার লোক হে তুমি?

তবু ভালো, লোকগুলো তাকে চেনে না! জড়ানো গলায় গ্রামের নাম বললে নীলাম্বর।

—দেড় মাইল ঠেঙিয়ে অ্যাদ্দুরে এলে তাড়ি গিলতে? শখ বটে! তা কোন্ বাড়ীর লোক? চিনতে পারছি না তো?

নীলাম্বর জবাব দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললে, ক'টা বেজেছে?

—তা হবে দশটা সাড়ে দশটা। যাও এখন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। চলতে পারবে?

—পারব।—নীলাম্বর উঠে দাঁড়ালো। মাথার ভেতরে একটা ফাঁকা আকাশ হা হা করছে যেন। যেন নাক-মুখ-চোখ তার কিছুই নেই—কাঁধের ওপর একটা শূন্য করোটি বয়ে চলেছে সে।

একজন বললে, আমরা ডিফেন্স পার্টির লোক। বলো তো, সঙ্গে করে পৌঁছে দিই।

—দরকার হবে না—তবে—ছু পা এগিয়ে নীলাম্বর থেমে দাঁড়ালো ঃ কোন্ দিক দিয়ে যাই বলো তো ?

লোক ছুটো হা হা করে হেসে উঠল ঃ তাড়ির নেশায় সব বেভুল হয়ে গেছে ? ওই তো নতুন হাসপাতালের আলো দেখা যাচ্ছে, ওই পূর্ব-দক্ষিণ কোণায়। কিন্তু মাঠ পেরিয়ে যেয়ো না, বিস্তর আলাদ গোখুর আছে এদিক-ওদিক। ডান ধারে একটু এগিয়ে গেলেই জেলা বোর্ডের রাস্তা আছে, তাই ধরেই যেয়ো।

—আচ্ছা।

নীলাম্বর চলতে লাগল। পেছন থেকে আবার অযাচিত উপদেশ কানে এল ঃ ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে কেন যে এ-সব নেশা ভাং করো বাবু—এতে কী সুখটা পাও!

নীলাম্বর জবাব দিল না। জবাব দেবার কিছুই নেই।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? একি—কী হয়েছে—বলেই পিছিয়ে গেল পীতাম্বর। খানিকক্ষণ আগেও সে যে পথে পথে ছোট ভাইকে খুঁজে এসেছে, মলিনাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, 'গেছে হয়তো চেনা-জানা কারুর বাড়ীতে, গল্প-টল্প করছে'—তারপর ছুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে এই এগারোটা পর্যন্ত বাইরের বারান্দায় বসে রয়েছে—সব তার কাছে এখন সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে হল।

গলা চিরে বীভৎস একটা চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইছিল, নিজেকে সামলে নিলে পীতাম্বর। শুধু মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললে, ভেতরে যা।

মাথা নীচু করে সামনে থেকে নীলাম্বর সরে গেল।

আর বাইরে সেই মোড়াটার ওপর তেমনি বসে রইল পীতাম্বর। ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে লাগল, মশা গুঞ্জন করে চলল, শীতের বাতাসেও ঘাম

গড়িয়ে পড়তে লাগল কপাল থেকে। মাথার ওপর কেউ যেন শক্ত একটা ভারী জিনিসের ঘা বসিয়ে তার সব ভাবনাকে ভোঁতা করে দিয়েছে।

আট বছর আগেকার সেই কদর্য মামলাটা। সেই সব অবিশ্বাস্য কাহিনী। অথচ লজ্জায় অপমানে মাটিতে মিশে গিয়ে তার প্রত্যেকটা কথাকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল। এতদিন জেলের ভেতরে যে শয়তানটা চাপা পড়েছিল, আবার সে মাথা চাড়া দিয়েছে।

গ্রামের লোক ঘটনাটাকে ভুলতে শুরু করেছে। সম্মানে মর্যাদায় সুখে দুঃখে দিন কাটছিল একরকম। আবার রাহুর ছায়া পড়ল এসে। দূরে কলকাতায় থাকলেও বা কথা ছিল—এখন পাপ এসে ঢুকল ঘরের ভেতর।

নিজের ভাই। যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি স্বাস্থ্য। মা-বাপ ভেবেছিলেন—

পিত্ত ওঠার মতো একটা তীব্র তেতো আস্বাদ মুখে নিয়ে পীতাম্বর বসে রইল কাঠের মতো।

—ঠাকুরপোর কী হল ?—ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মলিনা ঃ কোত্থেকে এল রাতে ? আর এসেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে! বললে, কিছু খাব না—খিদে নেই। কী হয়েছে ওর ?

পীতাম্বর জবাব দিল না।

—কি গো, কথা বলছ না যে।

পীতাম্বর চেয়ে রইল স্ত্রীর দিকে। আরক্ত চোখে, শুকনো খসখসে গলায় বললে, কী বলব আবার ?

—ঠাকুরপোর কী হয়েছে ?

আবার প্রচণ্ড একটা বীভৎস চিৎকার করতে ইচ্ছে হল পীতাম্বরের, কিন্তু সামলে নিলে নিজেকে। তার বদলে হিংস্রভাবে একটা বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করে বললে, কী আর হবে ; সারা গা থেকে গন্ধ বেরুচ্ছিল—টের পাওনি ? খাবে কি, কোন চুলো থেকে যেন পেট-ভর্তি তাড়ি গিলে এসেছে।

—ও মাগো!—সামনে ফণাতোলা সাপ দেখেছে, এমনি ভাবে আঁতকে উঠল মলিনা।

—এই সবে শুরু!—পীতাম্বর তেমনি বিস্বাদ গলায় বলে চলল, এর পরে আরো অনেক দেখতে হবে, শুনতে হবে—শেষকালে গাঁয়ে বাস করা চলবে না, মুখ লুকোতে হবে সুন্দরবনে গিয়ে!

মলিনা কিছুক্ষণ কথা খুঁজে পেল না। পীতাম্বর ঘন ঘন টান দিতে লাগল বিড়িতে, মনের আগুন বিড়ির মুখে ধক ধক করতে লাগল।

—ঠিক বলছ, তাড়ি খেয়েছে? অসুখ-বিসুখ—

বিশ্রীভাবে দাঁত খিঁচিয়ে পীতাম্বর বললে, থামো। পঞ্চান্ন বছর বয়েস হতে চলল, আমি এখনো ছেলেমানুষ—না?

আবার মিনিট খানেক চুপ করে মলিনা বললে, ওগো এখন কি হবে?

—আমার মাথা হবে, আমার মুণ্ডু হবে।

—ওভাবে রাগারাগি করলে তো চলবে না। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার, একটা উপায় তো ভাবতে হয়।

উত্তরে আধখাওয়া বিড়িটা পাশের নয়ানজুলির দিকে ছুঁড়ে দিলে পীতাম্বর।

মলিনা ফিসফিস করে বলে চলল, এত কেলেঙ্কারী হল, ফাঁসি যেতে যেতে বেঁচে গেল, তবু শিক্ষা হল না গো? আবার ওই রাস্তাই ধরেছে?

—তাই ধরবে।—দাঁতে দাঁত ঘষল পীতাম্বর: বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেলে ছাড়তে পারে আর? অথচ আজও আমি শরৎ ঘোষের সঙ্গে কথা কইছিলুম, ওর দোকানে হিসেব পত্তর রাখবার জন্যে একজন লোক নেবে—মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে। শরৎ ঘোষ তো সবই জানে, তবু আমারই মতো ভেবেছিল—জেল-টেল খেটে নীলু নিশ্চয় বদলে গেছে। একরকম কথাও দিয়েছিল। কিন্তু এর পরে আর—

সামনের রাস্তা দিয়ে আলোর বন্যা ছুটিয়ে একটা সরকারী জীপ গাড়ী কোথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল মলিনা। পেছনের লাল আলোটা অনেক দূরে ঝাপসা হয়ে এলে আস্তে আস্তে বললে, একটা পরামর্শ শুনবে আমার ?

—বলো।

—ঠাকুরপোকে সংসারী করে দাও। একটা বিয়ে থা হলে—

পীতাম্বর জ্বলে উঠল আগুনের মতো।

—ও হতভাগা তো গেছেই, তার সঙ্গে আর একটা মেয়েরও সর্বনাশ করব, বলতে চাও ?

সর্বনাশ কেন হবে। কত মেয়েই তো বারমুখো স্বামীকে—

—বারমুখো স্বামী আর খুনে হতভাগা এক নয়। তা ছাড়া কে মেয়ে দেবে ওকে ? গলায় পাথর বেঁধে মেয়েকে নদীতে ডুবিয়ে মারবে তার চাইতে। আর কোনো পাষণ্ড যদি রাজিই হয়, আমিই বাধা দেব।

—কী করবে তা হলে ?

—তাড়িয়ে দেব বাড়ী থেকে।

—মায়ের পেটের ভাই !

—কী করা যাবে ? হাতে-পায়ে গ্যাংগ্রীন হলে তা-ও কেটে ফেলতে হয়। —পীতাম্বর আর একটা বিড়ি বের করল, ঠোঁটে ছোঁয়ালো, তারপরে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলল সেটাকে, তামাকের গুঁড়োগুলো নির্মম ভাবে পিষতে লাগল হাতের তালুতে।

মলিনা মনের দিক থেকে সায় দিতে পারল না। ছোট দেওরটি সম্পর্কে স্নেহের কাঁটা খচ খচ করতে লাগল কোথাও। মনে পড়ল, নীলুকে দেখেছিল স্কুলের ছাত্র। এক মুখ হাসি নিয়ে ফিরে আসছে—দু-হাত ভর্তি প্রাইজের বই।

‘বৌদি, তুমি রামায়ণের কথা বলছিলে না ? এই দ্যাখো, বাংলায় ফার্স্ট হয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পেয়েছি, এটা তোমাকেই দিলুম, তুমি পড়বে।’

মলিনা বলল, কিন্তু সম্পত্তির অর্ধেক ভাগও তো তার আছে।

—দেব। দিয়ে আলাদা করে দেব।

—এক বাড়ীতে পৃথগন্ন হয়ে থাকবে?

—ক্ষতি কী।

—লোকে কি বলবে?

—এর চাইতে বেশি কী বললে আর?—পীতাম্বর উঠে দাঁড়ালো: এখন চলো, কি পিণ্ডি গিলতে দেবে, দাও। তোমার গুণধর দেওরের জন্যে তো সবাই মিলে উপোস করে থাকতে পারব না।

আর নীলাম্বর নিজের অন্ধকার ঘরে, দু'চোখ সম্পূর্ণ মেলে রেখে, নতুন মশারির কোরা গন্ধের গুমোটের ভেতর একভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। মনে পড়ল জঙ্গল কেটে এরোড্রাম, তার ভেতরে সারি সারি তাঁবু। দূর থেকে নেকড়ের চিৎকার আসছে, চারদিকের গাছ পালায় আদিম নিস্তব্ধ অন্ধকার—একটা পাখী পর্যন্ত ডাকছে না, কখনো সেন্ট্রির জুতোর আওয়াজ, কখনো মিলিটারী গাড়ীর শব্দ।

যুদ্ধ। মশারিটা তাঁবুর কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। যুদ্ধ!

জোর করে বন্ধু-বান্ধবেরাই প্রথম মদ খাইয়েছিল তাকে—উৎসাহ দিয়েছিলেন স্কোয়াড্রন লীডার।

'আমাদের দলে একা সতী-সাবিত্রী হয়ে থাকবে? ও চলবে না।

দু তিনজনে হাত-পা চেপে ধরেছিল, আর একজন একগ্লাস আগুন যেন ঢেলে দিয়েছিল গলার ভেতরে!

'লড়াইতে এসেছ ব্রাদার। কালকেই হয়তো অ্যাক্ অ্যাক্ ব্যাটারী নইলে এনিমি প্লেনের সঙ্গে মুখোমুখি ফাইটে সব খতম। যতক্ষণ বেঁচে আছ—বেপরোয়া হয়েই কাটিয়ে দাও।'

তারপরেই হিন্দী-ইংরেজি বাংলায় অশ্লীল কথার উল্লাস।

সেই শুরু। রক্ত, মৃত্যু, আগুন আর আতঙ্কের ভেতর ধীরে ধীরে সব সহজ হয়ে এল। আনুষঙ্গিকও বাদ গেল না। একটুখানি পোষাকী আবরণ দিয়ে তারও ব্যবস্থা রেখেছিলেন কর্তারা।

এক একটি নারীর জন্মে এক এক দলের কিউ দিয়ে দাঁড়ানোর সেই ছবি, ঘৃণা-লজ্জা-ভয়ের কোনো প্রশ্ন অবান্তর—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ আর স্বাভাবিক।

সেই আগুন থেকে বেরিয়ে এসেও যারা ঠিক রইল, পুরোনো অভ্যাসের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, মানিয়ে নিতে পারল, তারা ভাগ্যবান। কিন্তু নীলাম্বর পারেনি, আরও অনেকেই পারেনি। তারপর—

একটা যুদ্ধ কি শুধু কয়েকটা বছরের, কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যুর, কোটি কোটি টাকা ধ্বংসেরই ইতিহাস? আসল যুদ্ধ শুরু হয় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে—যখন তার দেনা মিটিয়ে দিতে হয় কড়ায় গণ্ডায়। নীলাম্বরও সেই দেনাই শোধ করছে।

ভালো হতে চেয়েছিল সে, দেশের কাজ করতে চেয়েছিল। কাল পদ্মকে দেখবার পর সেই ভালো হওয়ার ইচ্ছাটা একটা স্বপ্নের মতো জাল বুনছিল তাকে ঘিরে। কিন্তু যুদ্ধ তার রক্তের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, এই আট বছরে সাধ্যমতো অনুতাপ করেছে সে, জেলে তার গুড্-কণ্ডাক্টের খ্যাতি ছিল, অথচ! অথচ: ঠিক সময় বুঝে তারই ভেতর থেকে সেই জন্তুটা বেরিয়ে এল—যার হাত থেকে তার কোনোদিন পরিত্রাণ নেই?

পরিত্রাণ নেই? না—আমি বাঁচব, আমি ভদ্র, শান্ত, সহজ জীবনের মধ্যে আসব। ভাঙা বোবাধরা গলায় প্রার্থনার মতো করে বলতে চাইল নীলাম্বর—'আমাকে রক্ষা করো, আমায় শক্তি দাও—' কিন্তু নিজের চাপা গলার স্বর নিজের কানেই এমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক ঠেকল যে সে চমকে উঠল। মনে হল, তার গলার মধ্যে লুকিয়ে বসে কে আর একজন তাকে যেন ব্যঙ্গ করে চলেছে।

একবার ভাবল, আমি কাঁদব, কাঁদলে আমার বুকের ভার নেমে যাবে অনেকখানি। কিন্তু কাঁদতে পারল না। দুটো পলকহীন চোখে একভাবে মশারিটার দিকে চেয়ে রইল সে। সেই যুদ্ধের তাঁবুটা। তার সঙ্গ এখনো ছাড়েনি, কোনো দিন ছাড়বে না।

পরদিন সকালে শুকনো মুখে ভেতরের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিল পীতাম্বর। নীলাম্বর এসে দু-হাতে পা জড়িয়ে ধরল তার।

দারুণ চমকে উঠল পীতাম্বর।

—পা ছাড়, পা ছাড়। কী হয়েছে তোর ?

আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি দাদা, আর কোনোদিন আমি নেশা করব না।

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে পীতাম্বর কিছুক্ষণ মর্মভেদী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ভাইয়ের দিকে। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল অল্প অল্প, কথা বলতে পারল না।

—আমাকে একটা কাজ দাও দাদা, যা হয় কিছু করতে দাও। তা হলেই আমি বেঁচে যাব।

—ঠিক বলছিস ?

—ঠিক বলছি।

পীতাম্বর আবার হুঁকোটা টেনে নিয়ে নিঃশব্দে তামাক টানল কিছুক্ষণ। যেন মনস্থির করে নিতে চাইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তা হলে চা-টা খেয়ে তৈরী হয়ে নে। আমি তোকে নিয়ে যাচ্ছি শরৎ ঘোষের দোকানে। সেখানে একটা কাজ হতে পারে, কাল মাসের পয়লা তারিখ, কাল থেকেই লেগে যেতে পারবি।

নীলাম্বর আর একবার দাদার পায়ের ধুলো নিলে।

॥ ছয় ॥

শরৎ ঘোষের দুই ছেলেই চাকরি নিয়ে কলকাতায়। গ্রামের জন্যে তাদের আর টান নেই—বাপের দোকানে বসে ডাল-চাল-চিঁড়ে-মুড়ি থেকে খাতা-পেন্‌সিল-কাগজের দোকানদারী কিংবা তার হিসেব লেখা তাদের আর পোষায় না। শরৎ ঘোষের বয়েস হয়ে গেছে, এখন তারও পক্ষে আর এত দিক একা সামলানো সম্ভব নয়। পুরোনো একটি কর্মচারী ছিল, মাসখানেক হল সাপের কামড়ে সে মারা গেছে। শরৎ ঘোষ একজন ভালো লোক খুঁজছিল, এমন সময় এল পীতাম্বর।

—কাকা, জানেন তো, নীলু ফিরেছে!

—জানি।

—কী করা যায় ভাইটাকে বলুন দেখি?

শরৎ ঘোষ বিড়ি ধরিয়ে বললে, বিয়ে থা দাও। সংসারী করো।

পীতাম্বর বিস্বাদ হাসি হাসল: কে মেয়ে দেবে? লোকের তো আর কিছু অজানা নেই। তার ওপর চল্লিশ পেরিয়ে গেছে বয়েস।

—বাংলাদেশে মেয়ের অভাব হয় হে পীতাম্বর?

তা হয় না। পীতাম্বরও তা জানে। চিতা থেকে মড়া তুলে এনে পিঁড়েয় বসালেও পাত্রী এসে হাজির হবে দলে দলে। কিন্তু যে-কথা মনে এসেছিল সেটা বলা গেল না। 'আমার সাহসে কুলোয় না—এখনো ওকে আমার বিশ্বাস নেই।'

একটু চুপ করে থেকে পীতাম্বর বললে, দেখা যাক। কিন্তু তার আগে একটা কাজকর্ম তো দরকার।

—তা বটে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে পীতাম্বর দোকানের বেনেতি মসলার গন্ধ শুঁকল, চেয়ে রইল কুলুঙ্গির লাল টুকটুকে ছোট্ট

গণেশটির দিকে! লক্ষ্য করে দেখল মুশুরির ডালের বস্তার আশে-পাশে একটা নেংটি ইঁদুর ছুটোছুটি করছে, গুড়ের টিনের ওপর জড়ো হয়েছে গোটাকয়েক আরশোলা। তারপর ধীরে সুস্থে বললে, আপনার তো লোক নেই—না?

—নাঃ!—শরৎ ঘোষ এক মুখ বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল: শশধর মারা যাবার পর থেকে ভারী আথান্তরে পড়েছি। কেন যে কলমী শাক টেনে তুলতে গেল ওই এঁদো পুকুর থেকে, আর কোত্থেকে গোখরো সাপটা—শরৎ ঘোষের দীর্ঘশ্বাস পড়ল: এত ডাক্তার-বদ্যি এত রোজা—লোকটাকে বাঁচানো গেল না হে।

—কপাল।—পীতাম্বর দার্শনিকের মতো নিঃশ্বাস ফেলল: কার মরণ যে কোথায় কেউ তা বলতে পারে? তা ছাড়া লোকে বলেই, জলে কাটলে নাকি আর নিস্তার নেই।

শরৎ ঘোষের চোখের দৃষ্টি একবার দেওয়ালের কোণায় গিয়ে পড়ল। পেরেকের গায়ে ঝোলানো নীল-সাদা সুতোয় বোনা পুরোনো গামছাটায় ধুলো জমছে। ওটা শশধরের। রোজ দোকানে এসেই জামা খুলে রাখত ওই পেরেকে, তারপর গামছাটা কাঁধে ফেলে কাজ করতে বসে যেত। কত সহজেই মানুষ মরণের ভেতরে তলিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পরে শশধরের স্মৃতিটা একটু ফিকে হয়ে এল। তখন শরৎ ঘোষ বললে, কর্মচারী একজন খুঁজছি। লোক তো চাইলেই পাওয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাসী কাউকে—

পীতাম্বর বললে, নীলুকে রাখুন না?

—নীলু?

চমকটা পীতাম্বরের চোখ এড়িয়ে গেল না। শুকনোভাবে হাসতে চেষ্টা করল।

—ঠেকেই লোকে শেখে। এখন বদলে গেছে। ওকে বিশ্বাস করলে আপনি ঠকবেন না।

শরৎ ঘোষ পর পর ক'টা টান দিলেন বিড়িটায়। বললেন,

নিশ্চয়, ঠেকে শেখে বই কি? আমার দোকানে যে সব বইটই আনাই, সময় পেলে তার ছুটো একটা আমি পড়ে দেখি। সেদিন ছোটদের একটা বই পড়লুম কী যেন ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ—নামটা ভুলে গেছি। তাতে পড়লুম একটা নামজাদা চোর পাদ্রী সাহেবের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে তাঁরই জিনিসপত্র চুরি করে পালাচ্ছিল। যখন পুলিশে তাকে ধরে পাদ্রীর কাছে আনল, পাদ্রী বললেন, 'ও চোর নয়, আমিই ওকে ওগুলো দান করেছিলুম।' তাইতেই লোকটার জীবন একেবারে বদলে গেল। খাসা লেখা।

পীতাম্বর বললে লে মিজারেব্‌ল।

—তা হবে। কিন্তু ভালো সংসর্গে পড়লে নিশ্চয় মানুষ বদলে যায়, তা আমিও মানি।

পীতাম্বর ভরসা পেল। বললে, সেই জন্যেই নীলুর কথা আপনাকে বলছি। আপনি যদি ওকে রাখেন, আমার মনে হয় কাজকর্ম ও ভালোই করবে। তা ছাড়া আমিই তো জামিন রইলুম।

—গ্রামের ছেলে, তোমাদের সঙ্গে জ্ঞাত সম্পর্ক আছে, জামিন আবার কি হে।—বিড়িতে শেষ টান দিয়ে শরৎ ঘোষ বললে আমি ভাবছি, অনেক লেখাপড়া জানা ছেলে, মিলিটারী-ফেরত শেষকালে গোলদারী দোকানে খাতা লিখবে? ওকে আর কোথাও একটা ভালো কাজ-টাজ—

—কপাল!—পীতাম্বর কপালে আলগা করে ঘা দিলে একটা: জানেনই তো সব।

শরৎ ঘোষ ভাবলেন কিছুক্ষণ। লে মিজারেব্‌লের গল্পটা নিজের মুখেই শুনিয়ে দেবার পরে পিছিয়ে যাওয়াটা কেমন অশোভন লাগল তাঁর। মিনিট ছুই মনঃস্থির করবার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, নিয়ে এসো কাল। দেব লাগিয়ে।

এর মধ্যে রাত্রির ঘটনাটা ঘটে গেল।

পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে নীলাম্বর, তবু পীতাম্বরের মন থেকে

ছায়াটা কিছুতেই সরতে চাইছে না। এই শুরু, শেষ নয়; সেই কুৎসিত মামলা। আট বছরের জেল খেটে বাড়ী ফিরে আসা, তারও পরে নীলাম্বরের নেশার দিকে টান। কোন বে-পাড়া থেকে তাড়ি খেয়ে মাঝরাত্রে ফিরে এল টলতে টলতে। এত লজ্জা অপমানেও যার চৈতন্য হয়নি। একটা প্রতিজ্ঞার কথা কতক্ষণ তার মনে থাকে? শরৎ ঘোষের দোকানে একরাশ নগদ কাঁচা-পয়সা নিয়ে কারবার, যদি—

যদি কিছু ঘটে তা হলে নীলুর কিছু আসবে যাবে না—বরং আর একবার জেল খাটবে। কিন্তু পীতাম্বর? আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর পথ থাকবে না। কেন দেশে ফিরল নীলাম্বর? আট বছর ধরে ধীরে ধীরে সে স্মৃতি হয়ে যাচ্ছিল, বরং তার জন্যে মধ্যে মধ্যে স্নেহ আর সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস পড়ত—ভাবতে চেষ্টা করা যেত তার বিশেষ কোনো অপরাধ ছিল না, হঠাৎ কুসঙ্গে পড়ে—

কিন্তু আজ সে চোখের সামনে। কাল রাত্রে যা ঘটে গেছে, তার পরে পীতাম্বর পায়ের তলায় রাখবার মত শক্ত মাটিই যেন খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও; যে স্নেহটুকু এতদিন ধরে বিন্দু বিন্দু করে জমে উঠেছিল—মুহূর্তে তা বিষ হয়ে গেছে। পীতাম্বর ভাবতে লাগল।

নীলাম্বর একটু চোখের আড়াল হলে মলিনাকে ডাকল সে।

—কী করি বলো দেখি?

—আমি আর কী বলব?

—শরৎ ঘোষের দোকানে ঢুকিয়ে দেব ওকে? কিন্তু যদি চুরি-চামারি করে পালায়?

—না-না, অতটা করবে না।

—করবে না?—পীতাম্বর জ্বলে উঠল: তা হলে কাল ওই কেলেঙ্কারীটা করে বসল কী করে?

—ভুল করে ফেলেছে। মলিনা সান্ত্বনা দিতে চাইল: তোমার পায়ে ধরে তো মাপ চাইল।

—মাপ চাইল, হুঁঃ!—পীতাম্বর ভ্রূকুটি করল: বিশ্বাস করতে বলো ওসব?

—নিজের ভাইকেও বিশ্বাস করবে না?

—নিজের ভাই!—দাঁতের ওপর দাঁত পিষল পীতাম্বর: তাই বটে। নিজের ভাই না হলে আর এমন করে যন্ত্রণা দেবে কে! পাপ ছিল আমার—পূর্বজন্মের অনেক পাপ, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আজকে।

—অথচ কী ভালো ছেলেই না ছিল!—মলিনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—ভালো জিনিস যখন পচে তখন তার দুর্গন্ধটাই সব চাইতে বেশি।—পীতাম্বর উঠে দাঁড়ালো: নিয়েই যাই শরৎকাকার কাছে। তারপর বরাতে যা হওয়ার হবে।

মলিনা বললে, একটা কথা বলব, রাগ করবে না?

পীতাম্বর সন্দিগ্ধভাবে তাকালো: আবার কী হল?

—আমি খবর পাঠিয়েছি।

—খবর? কাকে?

—মণিমামাকে। হরিবপুরে।

পীতাম্বরের চোখের দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠল: তোমার কথার মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মণিমামাকে হঠাৎ খবর পাঠাবার দরকার হল কেন? তিনি কী করবেন এখানে এসে?

—তুমি যে চটেই রয়েছ দেখছি। এমন করলে কোনো কথা বলা যায় নাকি তোমার সঙ্গে?

—চটি কি আর সাধে, সবই গ্রহের ফের। কিন্তু কী বলবে বলো।

মলিনা বললে,—একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো তবে। অত তাড়াহুড়ো করলে কথা হয়?

পীতাম্বর হতাশভাবে আবার চৌপাইটার ওপর বসে পড়ল: আচ্ছা, বলে যাও।

—মণিমামার মেয়ে দুলালী—মানে দুলীকে তো মনে আছে

তোমার ? সেই যে পায়ে মস্ত পোড়ার দাগটা—লোকে বলে শ্বেতী—যার জন্যে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরেও বিয়ে হল না ?

এইবার ব্যাপারটা আঁচ করল পীতাম্বর। ভ্রূদুটো তৎক্ষণাৎ জুড়ে এল একসঙ্গে।

—হুঁ !

তুলীর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ের কথা ভাবছি। বয়েসে বেমানান হবে না। মেয়েটা বাড়ীতে বসে অল্প-স্বল্প লেখাপড়া শিখেছে, তা ছাড়া ঘরকন্নার কাজে তো কথাই নেই। মামীমা মারা যাবার পরে সংসারটা তো ও-ই মাথায় করে রেখেছে। দেখতে আহা মরি না হোক, একেবারে হত-কুচ্ছিতও নয়। আর পায়ের দাগটার কথা যদি বলো—লোকে যাই বলুক, আমরা তো জানি, ছেলেবেলায় এক হাঁড়ি গরম জল উল্‌টে পড়ে—

—হুঁ !

—খালি হুঁ হুঁ করছ কেন ?—মলিনা বিরক্ত হয়ে উঠল : তুমি কি বলতে চাও খারাপ হবে !

—আমি কিছুই বলতে চাই না। তোমার মণিমামার যদি দড়ি-কলসী কেনবার পয়সা না থাকে, আমিই পাঠিয়ে দেব এখন।

—দড়ি-কলসীর কী হল ? মণিমামা সবই জানেন। তোমার মত মাথা তাঁর গরম নয়। বিয়ে করলেই মানুষের বারটান বন্ধ হয়ে যায়। তার ওপর চল্লিশ বছর বয়েস হল, ঠাকুরপোই বা কদ্দিন আর পাগলামি করে বেড়াতে পারবে ? তা ছাড়া আমাদের তুলীও শক্ত মেয়ে, দু'দিনের মধ্যেই ঠাকুরপোকে হাত করে নেবে, তুমি দেখে নিয়ো।

—নিজেরাই যখন সব ঠিক করে নিয়েছ, তখন আমাকে আর এ-সবের মধ্যে ডাক কেন ?—পীতাম্বর বিদ্রূপ করে বলল, বিয়ের সময় আমাকে একটা নেমন্তন্ন পাঠিয়ো, তা হলেই হবে।

—তোমার বাঁকা কথাগুলো ছাড়ো। মণিমামা এলেই আমি দিন-ক্ষণ ঠিক করে ফেলব।

—হুঁ, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে—যে-কোন আঘাতটা ঝেড়ে ফেলতে পারলে সোয়াস্তি পান এখন। তা ভালো—একটা তীক্ষ্ণ হাসি ফুটলো পীতাম্বরের মুখে: তা পাত্রটি? সে রাজী হয়েছে?

—তাকে রাজী করাবার ভার আমার!

—খুব আত্মবিশ্বাস দেখছি।—চৌপাই ছেড়ে পীতাম্বর উঠে পড়ল: যা পারো তোমরাই করো। শুধু আর একটা খুনের পাপে আমাকে জড়িয়ো না—এইটুকুই জানিয়ে গেলুম তোমাকে।

—কী যে অলক্ষুণে কথা বলো, কোন মাথামুণ্ডু নেই তার—মলিনার সারা শরীর শিউরে উঠল।

—মাথামুণ্ডু আছে কি না, পরে বুঝবে—কথাটাকে এইখানেই শেষ করে দিয়ে বিস্বাদ মুখে পায়ের চটিটা টানতে টানতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর। অকারণেই বেরিয়ে গেল।

নীলাম্বর ভর্তি হল শরৎ ঘোষের দোকানে।

সকাল সাতটা থেকে বেলা এগারোটা। তিনটে পর্যন্ত খাওয়া আর বিশ্রামের ছুটি, আবার রাত আটটা অবধি। তারপর ঝাঁপ বন্ধ করে রোজকার খাতা-পত্র মিলিয়ে বাড়ী আসতে রাত দশটা। খেয়ে শুতে না শুতেই ক্লান্তিতে যেন হাত পা ভেঙে আসে, চোখের সামনে ছোলার ডাল সাত সের আর দু' ডজন পেন্‌সিলের হিসেব কতগুলো হিজিবিজি ছবির জাল বোনে, সারাটা দিন ধরে স্নায়ুর ভেতরে জমে থাকা নানা মশলা-পাতির গন্ধে ক্লোরোফর্মের মতো তাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে অন্ধকারের কবরে তলিয়ে যায়। ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নে কখনো একটা গুড়ের নাগরী উল্টে পড়ে, কখনো ঘূর্ণি-হাওয়ায় এক রাশ তেজপাতা উড়তে থাকে তার চারদিকে।

সময় নেই, নিজেকে নিয়ে ভাববারও অবসর মেলে না। শুধু বৃহস্পতিবার দোকান বন্ধ, শুক্রবার সকালটাও ছুটি। নীলাম্বর ছিপ

নিয়ে বসে পুকুরে। এঁদো হয়ে গেছে, মাছ বাড়ে না, পীতাম্বর পোনাও ছাড়ে না আর—কিছু কই-শিঙ্গি-মাগুর আর তুটো চারটে চুনোপুঁটি গোকুলে বাড়ছে। তারই তুটো চারটে ওঠে ছিপে, একরকম ভাবে বেলা গড়িয়ে যায়।

আর মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে পুকুরের ওপার দিয়ে শাদা চটি পায়ে চলেছে পদ্ম। পড়তে যাচ্ছে 'অ্যাডাল্‌ট এডুকেশনের' স্কুলে। অ্যাডাল্‌ট এডুকেশন! তুটো বড়ো বড়ো ইংরেজি শব্দ কত সহজে উচ্চারণ করেছিল পদ্ম। লেখাপড়া শিখছে, সপ্রতিভ হয়েছে, আগেকার দিনের বাল-বিধবার মতো আর একাদশী অম্বুবাচী করে দিন কাটায় না, সংসারের নিছক একটা বোঝা হয়েই সে বসে নেই। নিশ্চয় এর পরে দেশের কাজ করবে। কী কাজ করবে কে জানে!

শুধু নীলাম্বরই কোন কাজে লাগল না। তাকে শুধু দিনের পর দিন কাটিয়ে যেতে হবে এক ভাবে। চল্লিশ টাকা মাইনের খাতা লিখতে হবে শরৎ ঘোষের দোকানে। শরৎ ঘোষ খুশিই আছেন। বলেছেন মাইনে বাড়িয়ে দেবেন। কত বাড়িয়ে দেবেন? চল্লিশ টাকার ইন্‌ক্রিমেণ্ট কত হয়? তিন টাকা? পাঁচ টাকা? নীলাম্বর জানে না।

পাঁচ টাকা হলে খুব ভালো। মাসের বিড়ির খরচটা উঠে আসবে।

পুকুরের কাল্‌চে জলের ভেতরে আজো ছিপ ফেলে দার্শনিকের মতো বসেছিল নীলাম্বর। এক ঘণ্টা ধরে একটাও ঠোকর পড়েনি বঁড়শীতে। চোখের সামনে ছোঁ মেরে মাছরাঙা কি একটা মাছ ধরে নিয়ে গেল, নীলাম্বর ঈর্ষাভরা দৃষ্টি ফেলল সেদিকে।

মলিনা ঘাটে চাল ধুতে এসেছিল। ধোয়া হয়ে গেলে নীলাম্বরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—মাছে খাচ্ছে না?

—খাবে এখন।

—আর খাবে! থাকলে তো কিছু। যা-ও তু'চারটে হয় রাত্তিরে লোকে চুরি করে নিয়ে যায়!

—তবু সময় তো কাটছে।

—তা কাটছে।—মলিনা হাসল : সময় কাটাবার আরো ভালো ব্যবস্থা তোমার করছি ঠাকুরপো। বৌ আনছি শিগগিরই।

ফাৎনা পড়ছিল এতক্ষণে। সেদিকে চোখ রেখে নীলাম্বর বললে, কার জন্যে?

মলিনা শব্দ করে হেসে উঠল : তোমার দাদার জন্যে নিশ্চয় নয়। তাহলে কি আমি এত আনন্দ করে ঘটকালি করতুম নাকি? তোমার বৌ আনছি ঠাকুরপো।

মলিনা ভেবেছিল, একটা কিছু ঘটবে, আপত্তি করবে নীলাম্বর, তারপর অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধীরে সুস্থে রাজী করাতে হবে তাকেই।

কিন্তু নীলাম্বর সংক্ষেপে বললে, তা বেশ।

এবার মলিনা চমকে উঠল।

—তোমার আপত্তি নেই ঠাকুরপো?

—না।

মলিনার প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল : ধরো মেয়েটি যদি একটি খুঁতো হয়? পায়ে শাদা পোড়া দাগ থাকে?

—আমায় কেউ বিয়ে করতে রাজী হবে, এইটুকুই যথেষ্ট বৌদি। —ফাৎনাটা জলের ওপর স্থির হয়ে গেল, দু-একটা ঠোক্কর দিয়েই মাছটা পালিয়েছে। নীলাম্বর আবার পিঠ সোজা হয়ে উঠে বসল : কিন্তু আমার মৃগী সেটাও জানিয়ে দিয়ো ওদের।

—ও কিছু না।—ধরা গলায় মলিনা বললে, কিন্তু সত্যিই তুমি বিয়ে করবে? ঠাট্টা করছ না!

—না।

মলিনা চালটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল। নীলাম্বরের এত সহজে, এমন নিশ্চিন্তভাবে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাওয়াটা তার ভালো লাগল না। একেবারেই ভালো লাগল না।

॥ সাত ॥

পঞ্চায়েতের কতগুলো কাগজপত্র দেখছিল পীতাম্বর। মলিনা পাশে এসে দাঁড়ালো।

—কই গো সন্দেশ খাওয়াও আমাকে।

—কেন? এমন শুভ-সংবাদটা কিসের?

—ঠাকুরপো বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

—বটে?

—একটিবারও না নেই. বলবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজী। যেন মুখিয়েই বসেছিল।

কাগজগুলো ঠেলে সরিয়ে দিলে পীতাম্বর, স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখল। খুশি হওয়ার লক্ষণ চোখে মুখে ফুটে উঠল না কোথাও, শুধু কপালটা কুঁচকে রইল।

—সিরিয়াস্লি বিয়ে করতে চাইছে? ঠাট্টা নয়?

—কোন্‌টা ঠাট্টা কোন্‌টা সত্যি সে-কথা বোঝবার বয়েস আমার হয়নি নাকি? তুমি কি ভাবো আমাকে?

পীতাম্বর চোখের চশমাটা খুলে ফেলল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, তোমার সেই মণিমামার মেয়েকে?

মলিনা মাথা নাড়ল।

—মেয়ের খুঁতের কথা বলেছ?

—সব বলেছি। তার কিছুতেই আপত্তি নেই। আমার তো মনে হল, ওর তর সইছে না। এক্ষুণি গিয়ে বরাসনে বসতে পারে।

—হুঁ।—টেবিল থেকে একটা পেন্‌সিল তুলে নিয়ে তার গোড়াটা কামড়ে চলল পীতাম্বর, কথাটাকে কী ভাবে যে নেবে সেইটেই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ঠিক মলিনার মতো তারও মনে হয়েছে,

এক কথায় এমন করে রাজী হওয়াটাই কেমন সন্দেহজনক, যেমন হওয়া উচিত তা নয়। এ যেন অনেকখানি সূতোর জট এক টানে ছিঁড়ে ফেলা, ধীরে ধীরে ধৈর্য ধরে যা খুলে নেওয়া উচিত ছিল—খুব সহজেই সেটাকে মিটিয়ে দেওয়া। মলিনার ভালো লাগেনি, পীতাম্বরেরও লাগলো না।

—বেশ তো এয়ো ডাকো, চাল-চিঁড়ে কোটো, বরণ ডালা সাজাও।

একটু চুপ করে রইল মলিনা। বললে, তুমি খুশি হওনি?

পীতাম্বর সংক্ষেপে জবাব দিলে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

কিন্তু পীতাম্বরের মনে যতই ছায়া ঘনিয়ে থাক, মলিনার যতই মনে হোক ঠাকুরপো এত সহজেই রাজী না হলে ভালো লাগত আর শরৎ ঘোষের দোকানে খাতা লেখার অবসরে একটা শূন্য অবসাদ বয়ে যতই পুকুরঘাটে ছিপ নিয়ে বসে থাকুক নীলাম্বর, কিছুই আটকে রইল না। কয়েকদিনের মধ্যেই ছাতা আর পুঁটুলি বগলে এসে পড়লেন মণিমামা। তাঁর সঙ্গে এল কৃষ্ণগোপাল—সম্পর্কে ভাইপো।

লম্বা কুঁজো চেহারার লোক মণিমামা, বয়েসের চাইতেও অভাবের ভারে বেশি ক্লান্ত। মাথার ছাঁটা ছাঁটা ছোট চুল বেশির ভাগটাই শাদা; এক সময় জমিদারের তশীলদারী করতেন—এখন জমিদারী নেই, তশীলদারীও নয়। সামান্য কিছু জমি জমা নাড়াচাড়া করেই সংসার চালাতে হয়—কিন্তু দুর্বৎসরের দিনগুলো আর কাটতে চায় না। তার ওপর ঘরে ছাব্বিশ সাতাশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে। নেহাত আজকাল এ-সব নিয়ে পাড়াগাঁয়ের কেউ মাথা ঘামায় না—নইলে ওই মেয়ের জন্যেই গ্রাম থেকে বাস তুলতে হত মণিমামাকে।

মেয়েটাকে এখন কাঁধ থেকে নামানো দরকার। যে করে হোক গলার কাঁটা বিদেয় করা চাই। সম্বন্ধ জুটিয়েছিলেন প্রচুর, কিন্তু পায়ের পাতায় পোড়া দাগটা কিছুতে লুকোনো যায় না, আর মেয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সকলের চোখ সেদিকে গিয়ে পড়ে।

মণিমামা নানা ভাবে বলেছেন, আজ্ঞে ও দাগটা কিছুই নয়, ছেলেবেলায় খানিকটা গরম জল পড়ে—

অবিশ্বাস কেউ-ই করেনি। সবাই মাথা নেড়ে জানিয়েছে, সে তো বটেই, পুড়ে গেলে ওরকমটা হয়। তারপর যাওয়ার সময় বলে গেছে, মেয়ে তো আপনার ভালোই, রান্না-বান্না সেলাই টেলাই সব তো জানে দেখছি—তবে কিনা আমাদের পছন্দ হল না।

বাড়ীতে এই নিয়েই বিশ্রী অশান্তি চলছে কয়েক বছর ধরে। মণিমামা রাগ করে বলেছিলেন, আমার মেয়ে আমার কাছেই পড়ে থাক। ওর বিয়ে আমি দেবই না।

মণিমামার বড়ো ছেলে শ্রীনিবাস জমি জমা দেখে, অবসর সময়ে শৌখিন যাত্রার কীচক-কংস-কলি-রাজার পার্ট করে, প্রায়ই গাঁজা-টাঁজা খায়। স্পষ্ট বক্তা বলে তার সুনাম আছে; কারো বাড়ীতে কোনো মারাত্মক দুঃসংবাদ পৌঁছে দিতে যখন গ্রামের আর কোনো লোক সাহস পাচ্ছে না, তবু ও-কাজটা করবার জন্যে শ্রীনিবাসই এগিয়ে যায়। কাজেই বাপকেও সে রেয়াৎ করল না।

—বিয়ে তো দেবে না। কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছ, দুদিন বাদে তুমি চোখ বুজলে ওই ধেড়ে আইবুড়ো মেয়ের ভার বইবে কে? আমি পারব না—সে-কথা সাফ বলে দিচ্ছি।

বড়ো ছেলে মাকে বলে দিয়েছে, ছোট ছেলে কী বলবে সে-কথা আন্দাজ করাও শক্ত নয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকে এরা পথে বের করে দেবে তা-ও নিশ্চিত। কাজেই যেমন করে হোক, বিয়ে একটা দিতেই হবে। ছেলে কাণা হোক, আর খোঁড়া হোক, আশী বছরের বুড়ো হোক কিংবা জেল খাটা দাগী আসামী হোক, মণিমামার আর কিছুতেই আপত্তি নেই।

অতএব নীলাম্বর।

মেয়ের মা বেঁচে নেই, থাকলে হয়তো কেঁদে ভাসাত। ওই একটা আপদ থেকে মণিমামার বাঁচোয়া। আর পাঁচ বছর আগে শেষবার

মেয়ে অপছন্দ হয়ে যাওয়ার পর থেকে তুলী অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে গেছে নিজের ভেতর ; হাসে না, কাঁদে না, কথা বলে না ; নিঃশব্দে সংসারের কাজ করে, ধান সেদ্ধ করে, দাওয়া নিকোয়, গোরুর জাবনা কাটে, রান্না করে, বড়ো বউয়ের ছেলেপুলে কোলে কাঁখে বয়ে বেড়ায়। আর শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, চোখের কোণে কালি ঘনাচ্ছে, উঠে আসছে গালের হাড়। একটু একটু করে মরে যাচ্ছে মেয়েটা।

নীলাম্বর—নীলাম্বরই সই। খুনের মামলায় জেল খেটেছিল ? কী আসে যায় তাতে—মানুষে দু'টো একটা ভুল তো করেই। খুনটা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি, চট করে হজম করা মুশ্‌কিল, কিন্তু একথা ভুললে চলবে কেন যে নীলাম্বব মিলিটারীতে ছিল। সেখানে রাত দিন খুনোখুনি দেখতে দেখতে মানুষের মন কি আর ঠিক স্বাভাবিক একটা অবস্থার ভেতরে থাকে !

এগুলো ঠিক সান্ত্বনা নয়, তবু একভাবে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। আর প্রবোধ দিতে না পারলেই বা কেমন করে চলবে ! মেয়েটা তিলে তিলে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে—সে আর চোখে দেখা যায় না ; আর এর মধ্যে যদি মণিমামার মৃত্যু হয় তা'হলে দু'টো চণ্ডাল ভাইয়ের হাতে পড়ে ওর যে কী দুর্গতি হবে সে কথা ভাবতে পর্যন্ত রক্ত শুকিয়ে আসে।

নীলাম্বর ? কেন নীলাম্বর নয় ? বয়েস বেশি ? নইলে তুলীব সঙ্গেই বা মানাবে কেন ? খুন করেছিল ? ওটা মিলিটারীতে চাকরি করবার ফল, মানুষ কি আর বদলায় না কোনদিন ?

অতএব এসে পড়েছেন মণিমামা। সঙ্গে কৃষ্ণগোপাল।

পীতাম্বর খোলাখুলিই কথা বললে। কোনো আড়াল সে রাখতে চায় না।

—জানেনই তো সব।

—জানি।

—এখন অবশ্য চাকরি বাকরি করছে, দোকানের সময়টুকু ছাড়া

ঘর থেকে বেরোয়ই না বলতে গেলে। তবু আপনার মেয়ে—দশবার ভেবে দেখুন।

—ভেবে আমি দেখেছি বাবা। ভেবে চিন্তে এসেছি তোমার কাছে।

—যদিও এখন আর ভয়ের কিছু নেই, তবু ভবিষ্যতের কথা কে জোর করে বলতে পারে। যদি কিছু অশোভন—পীতাম্বর একবার কাশল, সেই রাত্রে নীলাম্বরের তাড়ি খেয়ে ফিরে আসাটা বিশ্রীভাবে মনে পড়ে তার ঃ মানে এক-আধটু যদি কিছু হয়—হবে না বলেই তো মনে হচ্ছে—আমাদের আপনি দুষতে পারবেন না।

—দুষে কী হবে বাপ।—মণিমামা নিঃশ্বাস ফেললেন, সবাই নিজের কপাল নিয়ে আসে। রাজার ঘরে পড়েও মেয়ে সুখী হল না —এমনটাও তো দেখা যায়।

—সে ভাবে দেখলে অবশ্য কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু আমাদের কথা জানিয়ে দিলুম আপনাকে। আর একটা জিনিস। নীলুর কিন্তু মৃগী আছে।

—ও কিছু নয়। অনেকেরই থাকে।

এইবারে একটা বিদ্বিষ্ট দৃষ্টি ফেলল পীতাম্বর। আশ্চর্য নিষ্ঠুর মনে হল লোকটাকে। স্বার্থের গরজে মেয়েটাকে জবাই করতেও বোধ হয় আপত্তি নেই। কিন্তু যার পাঁটা সে যেদিকে খুসি কাটুক, পীতাম্বরের বলবার কিছু নেই।

—তা হলে আপনি বলছেন এই মাসেই?

—হাঁ বাবা, এই মাসেই। আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না, বেশি দেরী করতে ভরসা হয় না। আমি আশীর্বাদ করবার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছি।

ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসি ফুটল পীতাম্বরের ঃ তা বেশ-বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই।

দিন বুঝেই এসেছেন মণিমামা—বৃহস্পতিবার। নীলাম্বর বাড়ীতেই

ছিল। এতগুলো ঘটনা ঘটছে, তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে এল, তবু কোনোদিকে তার লক্ষ্য ছিল না। পুকুরের ধারে বাবলা গাছের নীচে বসে সে ছিপ ফেলছিল। ওপর থেকে টুপটাপ করে বাবলার ফুল ঝরছিল—যেন গায়ে হলুদের রং পড়ছিল নীলাম্বরের ঘাড়ে, মাথায়, কোলের ওপর। বাতাসে জোলো ঘাস আর শ্যাওলা দুলছিল, ফড়িঙের পাখা কাঁপছিল তাদের ওপর, জলের মধ্য থেকে একটা ঢোঁড়া সাপ কি ভেবে এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল নীলাম্বরকে, নীলাম্বরের ঠিক পায়ের কাছে গর্তের ভেতরে একটা কাঁকড়ার লাল দাঁড়া একবার বেরুচ্ছিল, আর একবার ঢুকে যাচ্ছিল।

নীলাম্বর নিরাসক্ত ভাবে চেয়েছিল ফাৎনার দিকে। কখনো কখনো পুঁটি-ফুঁটি বঁড়শীতে ঠোক্কর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রুই-কাত্‌লার দেখা নেই। এমন সময় কৃষ্ণগোপাল এসে হাজির।

—কি হে, ভুলে-টুলে গেলে নাকি আমাদের?

কৃষ্ণগোপালকে ভোলবার কথা নয়। এক সঙ্গেই স্কুলে পড়ত দু'জন। নীলাম্বর ভালো রেজাল্ট নিয়ে চলে গেল, কৃষ্ণগোপাল ম্যাট্রিকুলেশনে ফেল করল। তারপর অনেকদিন আর দেখা নেই। তবু কৃষ্ণগোপালকে ভোলা যায় না। সেই বেঁটে কালো শক্ত ধাঁচের চেহারা। মুখে সব সময় আহ্লাদে একটা হাসির ভঙ্গি, চোখদুটো যেন অকারণ কৌতুকে চক চক করছে। এই ধরণের লোকের চেহারা সহজে বদলায় না, কৃষ্ণগোপালও বিশেষ বদলায়নি। শুধু বাড়তির ভেতরে একটুখানি টাক পড়েছে আর পানের রসে দাঁতগুলো কালো হয়ে গেছে।

নীলাম্বর ক্লান্তভাবে হাসল: ভুলব কেন? ভালো আছো তো কেষ্ট?

—ভালো কি আর থাকা যায় হে—যা দিনকাল! বত্রিশ টাকার নীচে চাল নেই—লোকের অবস্থা ভাবতে পারো!

নীলাম্বর জবাব দিল না। দিনের ভেতর হাজারবার ওই একটা

কথাই শুনতে হয়, আর শুনতে শুনতে ঘুম আসে এখন। সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সবাই জোরালো গলায় আলোচনা করে, আবার সবাই পাশের গঞ্জে সিনেমা দেখতেও যায়, গ্রামোফোন রেকর্ড কিনে আনে, ব্যাটারীর রেডিয়ো সেট চালায়। মরে বোধ হয় গাঁয়ের চাষাভূষো-গুলো—নীলাম্বর ঠিক জানে না।

—তুমি শরৎ ঘোষের দোকানেই কাজ করছ তা হলে ?

—কিছু একটা তো করা উচিত।

—তা বটে। কিন্তু যাই বলো, এসব তোমায় মানায় না।

নীলাম্বর আবার হাসল। কথা বললে না। এবার ধপ করে তার পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়ল কৃষ্ণগোপাল।

—তুমি তো আমাদের ভগ্নীপতি হতে যাচ্ছ হে। কাকা তোমায় আশীর্বাদ করতে এসেছেন।

—তোমাদের অনুগ্রহ।

—অনুগ্রহ কি বলছ, ভদ্রলোককে তুমি বাঁচালে। গলায় পাথর বেঁধে ডুবে মরছিলেন।

—সেই পাথরটা বোধহয় এবার মেয়েটার গলাতেই বেঁধে দিলে তোমরা।

—কী বকছ তার ঠিক নেই। বিনয় করে দরকার কী—বিয়ে-থা করো, সংসার করো, সুখী হও। মেয়েটা খুব কাজের হে—ভারী শান্তশিষ্ট, মুখ বুজে রাতদিন খাটতে পারে। আমি তা ভাবছি না। আমার কেবল মনে হচ্ছে, এইভাবে শরৎ ঘোষের দোকানে ধনে-জিরে-গরম মসলার হিসেব লিখে নিজেকে নষ্ট করছ তুমি।

—নষ্ট আমি হয়েই গেছি, নতুন কিছু করছি না।

—এ-সব ভাবতে নেই হে, বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময় তোমার এখনো আসেনি—কৃষ্ণগোপাল একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে, তুমি হয়তো জানো না, আজকাল আমিও ব্যবসা করছি। ভালোই আছি তোমাদের আশীর্বাদে।

মাছ আজ আর উঠবে না, শুধু বসে থাকাই বিড়ম্বনা। নীলাম্বর ছিপ তুলে ফেলল, তারপর ভালো করে চেয়ে দেখল কৃষ্ণগোপালের দিকে। সন্দেহ নেই, সর্বাঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যের একটা তৈলাক্ত মসৃণতা, গোল মুখের থুত্‌নিতে দু-দুটো ভাঁজ পড়েছে। চোখ দুটোতে তরল আরাম আর অর্থহীন কৌতুকের ঝিলিমিলি। গলায় এক ছড়া সরু সোণার হার দেখা যাচ্ছে, দুহাতে গোটা পাঁচেক আংটি—একটাতে বোধ হয় ভরিখানেক প্রবাল বসানো।

—কিসের ব্যবসা করছ কেষ্ট?

—চাল, সুপুরি, কাপড়—আরো ইয়ে—নানা রকম। —কৃষ্ণগোপাল গলা নামালো: তবে কি জানো এক আধজন একটু সাহসী লোকের দরকার। মানে তোমার মতো যদি কাউকে পাওয়া যেত—মানে যার নানা রকম অভিজ্ঞতা আছে—

—তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না কেষ্ট। ব্যবসার জন্য সাহসী লোকের দরকার কেন? তুমি তো আর সুন্দরবনে গিয়ে কাউকে বাঘের ছাল ছাড়িয়ে আনতে বলছ না।

—সুন্দরবনে গিয়ে বাঘের ছাল ছাড়িয়ে আনা। হা-হা-হা—কৃষ্ণগোপাল দুলে দুলে হাসল, দু-দুটো ভাঁজপড়া থুতনিতে ঢেউ উঠল গোটাকয়েক: বেশ বলেছ কথাটা। তা অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে সেটা বাঘের ছাল ছাড়িয়ে আনবারই সামিল। আমি ক'দিন থেকে ভাবছিলুম নিজেই তোমার কাছে আসব—একটু আলোচনা করব তোমার সঙ্গে। মানে তোমাকে যদি পাই তা হলে—তা হলে আমারও সুবিধে, তোমারও সুবিধে। এই ইয়ে—কম করেও মাসে চার পাঁচশো টাকা ঘরে আনতে পারো।

—চার পাঁচশো টাকা! কী বলছ তুমি?

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কৃষ্ণগোপাল, দোরগোড়ায় দেখা দিল মলিনা।

—ঠাকুরপো, বাড়ীতে এসো একবার। তোমার দাদা ডাকছেন।

কৃষ্ণগোপাল আদর করে একটা থাবড়া মারল নীলাম্বরের পিঠে।

—যাও হে যাও, পাকা দেখা-টেখা কিছু হবে বোধ হয়। আজ শুভদিনে এ-সব ব্যবসা-ট্যাবসার কথা বরং থাক। আর তুমি তো আমার কুটুম হতে যাচ্ছ হে—সাক্ষাৎ ভগ্নীপতি—তোমার সঙ্গে মন খুলে আলাপ করবার সময় অনেক পাওয়া যাবে। আর—কৃষ্ণগোপাল একটু থামল: আমার কথাগুলো কাউকে বোলোটোলো না—জানোই তো, কী বলে—দিনকাল তেমন ভাল নয়!

নীলাম্বরের বিয়ে হয়ে গেল। কোথাও কিছু আটকালো না, মণিমামা সাধ্যমতো আয়োজন করেছিলেন, লোকজন এল, খাওয়া-দাওয়া হল, সবাই একবাক্যে বললে, বেশ মানিয়েছে। শুধু মেয়ের পিসির মুখের মেঘ কাটল না আর পীতাম্বর আগাগোড়া গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে বসে রইল।

বেশ মানিয়েছে—সন্দেহ কী! চল্লিশ বছরের বর, জেলখাটা খুনী আসামী, তার ওপর মৃগী রোগ আছে। সাতাশ বছরের জীর্ণ লম্বা একটি কনে—শুভদৃষ্টির সময় নীলাম্বর দেখেছিল, চোখ দুটো যেন তার অন্ধকারে তলিয়ে রয়েছে। দুজনেই ক্লান্ত—দুজনেরই কোনো আশা নেই, স্বপ্ন নেই, ভবিষ্যৎ নেই। চমৎকার বিয়ে!

এই ভালো। এর চাইতে সুখের শুভ-বিবাহ কী আর হতে পারত!

সম্প্রদানের সময় নিজের মুঠোর ভেতরে দুলালীর হাতের স্পর্শ পেল নীলাম্বর। সে হাতে লজ্জার শিহরণ নেই, ভয়ের ছোঁয়াচ নেই, অনিশ্চয়তার এতটুকু কাঁপুনি নেই। হাতখানা যেন কাঠের মতো শক্ত। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিমানের মেজেতে উবুড় হয়ে শুয়ে আছে তার কো-পাইলট বন্ধুটি। হাত ধরে তুলতে গিয়ে এমনি একটা স্পর্শ বোধ হয়েছিল তার—তারপর দেখেছিল তার কপাল থেকে একটা রক্তের ধারা বেয়ে মেজেতে জমাট বেঁধেছে—শত্রু-বিমানের একটা গুলি কখন শেষ করে দিয়ে গেছে তাকে।

হঠাৎ তার মনে হল, এমনি একটা মৃত্যুর সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছে। একজন হত্যাকারীকে মৃত্যু ছাড়া আর কে অনুসরণ করবে—কেই বা করতে পারে!

নীলাম্বরের মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল একটা।

সে পর্যন্তও সয়েছিল, কিন্তু কেলেঙ্কারী হল ফুলশয্যার রাতে।

এতক্ষণ যে মড়ার মতো নিঃসাড়ভাবে চেলির ভেতরে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল, নীলাম্বরের হাতের ছোঁয়া লেগে সে ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘরের আলোটায় নীলাম্বর দেখল অদ্ভুত আতঙ্ক ফুটে উঠেছে দুলালীর চোখে। যেন একটা মড়া প্রাণ পেয়ে উঠে আরো ভয়ঙ্কর একটা মৃত্যুর রূপ দেখছে সম্মুখে।

সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল, সে খুনী। এই একা ঘরে—এই নিস্তব্ধ রাত্রে—তার স্ত্রী দুলালীও তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল নীলাম্বরের। তার ওপর উবুড় হয়ে পড়ল বিছানার ওপর—হাত পা ছড়িয়ে গেল, মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে আওয়াজ উঠতে লাগল, বেরুতে লাগল গ্যাঁজলা।

আর কিছুক্ষণ পাথর হয়ে বসে রইল দুলালী। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে পাগলের মতো, আর্তস্বরে ডাকতে লাগল: দিদি—দিদি—দিদি—

চল্লিশ বছরে পা দিয়ে বিয়ে করবার কোন দরকার ছিল না। তবু রাজী হয়েছিল নীলাম্বর, মনে হয়েছিল প্রায় একটানা এই অর্থহীন জীবনে কোথাও অন্তত কিছু বৈচিত্র্য আসুক। অন্তত আর একজন এসে তার এই ক্লান্ত অসুস্থ দেহ মনের খানিকটা ভার নিক। বয়েস বাড়লে একটুখানি আশ্রয় পাবার আকুলতা জাগে, সেবার জন্যে মন লোভী হয়ে ওঠে। তাছাড়া মণিমামা যদি দায়মুক্ত হতে পারেন, সাতাশ বছরের আইবুড়ো মেয়ের ভার যদি তাঁর বুক থেকে নেমে যায়, তাহলে অন্তত একটা ভালো কাজও করা হলো।

ভালো কাজ!

সেই ফুলশয্যার রাত্রেই নীলাম্বর টের পেয়েছিল, ভালো করতে চাইলেই করা যায় না। মণিমামা কন্যাদায় থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু তুলালীর মন কি তাতে সায় দিয়েছিল? পাড়াগাঁয়ের যে মেয়েটি শরীরে একটা বীভৎস পোড়ার দাগ নিয়ে নিজের সম্পর্কে সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল, সেও কি নীলাম্বরের ভেতরে আকাশের চাঁদ হাতে পেল?

আশা তার ছিল না, তবু সে জানত, স্বামী স্বামীই—জেল ফেরত একজন খুনে আসামী নয়।

ফুলশয্যার রাতে তাকে মৃগীতে ধরেছিল। বাড়ীশুদ্ধ একটা বিশ্রী হৈ-চৈ ব্যাপার, নীলাম্বরের লজ্জার অবধি ছিল না। তারপর থেকে সে ঠিক করেছে এর পরে এমন একটা জঘন্য ব্যাপার আর সে কোনদিন ঘটতে দেবে না। দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত সহ্য করে যাবে, নিজের চেতনাকে কিছুতেই আয়ত্তের বাইরে ছেড়ে দেবে না সে। গ্রামে ফিরে আসবার পর সে প্রতিদিন প্রতিজ্ঞা করেছে—সে নতুন হবে, সহজ হবে, স্বাভাবিক হবে। চারদিকে আজ জীবনের রূপ বদলাচ্ছে—কংগ্রেসের নাম শুনলে যে থানার দারোগা এক সময় খাবি খেতেন তিনিই আজ কংগ্রেসের কাজ করতে বলছেন, গ্রামে পঞ্চায়েৎ হয়েছে, এমন কি পদ্ম পর্যন্ত অ্যাডল্‌ট এডুকেশনের মধ্য দিয়ে নতুন হতে চাইছে। নীলাম্বর আবার শুরু করুক—আর কিছুই যদি না পারে, অন্তত নির্ভেজাল একটি ভালো মানুষ হয়ে উঠুক।

কিন্তু তার প্রথম লজ্জা তাড়ির দোকান। দ্বিতীয় লজ্জা ফুলশয্যার রাতে অমন একটা কুশ্রী আবহাওয়া সৃষ্টি করে তোলা।

নিজেকে ভুলতে চাইলে যে ভোলা যায় না। তুলালীর চোখের তারায় সেই রাতেই নীলাম্বর তা জেনেছে: কোনো স্বপ্ন, কোনো আনন্দ, কোনো পরিতৃপ্তি, কোনো কৃতজ্ঞতা নিয়ে তুলালী তার জীবনে আসেনি। সাতাশ বছর বয়েস পর্যন্ত তার কোন আশাই ছিল না। ধান সেদ্ধ করে, দাওয়া নিকিয়ে, গরুর পরিচর্যা করে, ভাইয়ের

ছেলে-মেয়েদের কোলে কাঁখে টেনে—একটা বর্ণহীন ভবিষ্যৎকেই সে মেনে নিয়েছিল। সে জানত কোনোদিন তার বিয়ে হবে না, চিরটাকাল এমনি একভাবেই তার কেটে যাবে। তবু মাঘমণ্ডল আর পুণ্যপুকুরের ব্রত তার অফলা গেল না। শিব তাকে দয়া করলেন।

কিন্তু কোন স্বামী? কার ঘরে সে এল? মুখ ফুটে একটি কথাও সে বলেনি। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে তার চোখের দৃষ্টিতে কিছুই আর বুঝতে বাকি থাকেনি নীলাম্বরের। সেই থেকে নিজেকে বারবার একটি ধিক্কারই সে দিয়েছে: কেন এ কাজ করতে গেল সে, কেন মলিনার কথার সঙ্গে সঙ্গে সে সায় দিল, কে তার মাথার ভেতরে এই চিন্তাটা জুটিয়ে দিল, বিয়ে করা না করা তারপক্ষে দু-ই সমান?

সমান নয়। নিজেকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করো—শাকের কুচির মত ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দাও, বুকের ভেতরে একটা আগুনের তাওয়া জ্বেলে নিয়ে গুমে গুমে পুড়ে ছাই হয়ে যাও। কিন্তু আর একটা জীবনকে নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলতে চাও কোন সাহসে? সে অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?

তোমার ভার নেবে দুলালী? কেউ নিতে পারে তোমার ভার?

নীলাম্বরের মনের ভেতরটা জ্বলতে থাকে। ভুলের পর ভুল। কোথায় চলেছে সে—কোন পরিণামে গিয়েই বা পৌঁছবে?

আজ তিম মাস ধরে একটু একটু করে স্থির হতে চেয়েছে নীলাম্বর, কিন্তু ঢেউ থামে না। চাপা যন্ত্রণা রাতদিন তাকে কুরে কুরে খায়। শরৎ ঘোষের দোকানে তবু নিয়মিত কাজকর্ম করে যাচ্ছিল, এখন হিসেবপত্র মাঝে মাঝে ভুল হতে থাকে, শরৎ ঘোষের দৃষ্টি তাতে খুশি হয়ে ওঠে না।

একটা কিছু করতে হবে। এই অস্বস্তিটা কাটানো দরকার।

দুলালী সংসারের সঙ্গে মিশে গেছে। চিরকাল গেরস্ত বাড়ীতে গাধার মতো খেটে এসেছে, এখানেও তার কাজের বিরাম নেই।

ভোরের কাক ডাকবার আগেই কখন বিছানা ছেড়ে উঠে যায়, তারপর সারাদিন রান্নাঘরে পুকুরঘাটে মলিনার ছায়ার মতো ঘোরে। মলিনা খুশি, পীতাম্বরের কোনো নালিশ নেই।

নীলাম্বরেরই বা কী নালিশ থাকতে পারে? খেতে বসলে ঘোমটা টেনে ভাতের থালা নামিয়ে দেয়, চা আনে, জলখাবার দেয়, ঘর সাজিয়ে রাখে, জামাকাপড় পরিপাটি হয়ে থাকে, আলনায় বিড়ির কৌটো, সুপুরির কুচি সব হাতের কাছে থাকে, ময়লা গেঞ্জি আর পরতে হয় না। রাত্রে তারই পাশে এসে শোয়, কাছে টেনে আনলে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করে। প্রথম প্রথম কেঁপে উঠতো—এখন নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, যেন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। এর বেশী আর কী চাইতে পারে নীলাম্বর, এর অতিরিক্ত কী আর দাবি থাকতে পারে তার স্ত্রীর কাছে?

কিন্তু স্ত্রীকে যতখানি পায় নীলাম্বর, তারই ভেতরে কী ভয়ঙ্কর না-পাওয়া তাকে প্রত্যেক মুহূর্তে পীড়ন করতে থাকে। দুলালীর ভেতর দিয়ে যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন শূন্য অন্ধকারকে সে স্পর্শ করে। শরীরকে আশ্রয় করে যে ভালোবাসার ঘূর্ণি মাঝে মাঝে ফেনিয়ে ওঠে, শেষপর্যন্ত সে একটা অসহ্য আত্মগ্লানি আর অবসাদের মধ্যে ফেলে রেখে যায়। নীলাম্বরের নালিশ করবার কিছুই নেই।

কিন্তু—

—একখানা কাপড় কাচা সাবান দাও না গো?

নীলাম্বর চোখ তুললো। পদ্ম! চোখাচোখি হতেই পদ্ম হাসল।

—খুব মন দিয়ে খাতা লিখছিলে নীলুদা? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু।

—একটা হিসেব ঠিক মিলছিল না—নীলাম্বর লজ্জিত হল; এত বেলায় যে?

—গেরস্থ বাড়ীতে কখন কি দরকার পড়ে ঠিক আছে কিছু?

কিন্তু তোমারও তো দোকান বন্ধ করার সময় হল বোধ হয়। বাড়ী যাবে না এখন ?

—হ্যাঁ, এই উঠছি।—নীলাম্বর খাতা বন্ধ করে তাকে তুলে রাখল, একখানা সাবান দিলে পদ্মকে, পয়সা নিয়ে খুচরো ফিরিয়ে দিল পদ্মর হাতে, ক্যাশবাক্স বন্ধ করল, তারপর যে পেরেকের গায়ে শশধরের জামাটা ঝুলত, সেখান থেকে নিজের শার্টটা খুলে আনল।

পদ্ম বললে, তুমি এখন বাড়ী যাবে ?

—হুঁ।

—তা হলে চলো, এক সঙ্গেই যাই।

—তালা-টালাগুলো দিতে দু-চার মিনিট দেরী হবে আমার।

—তা হোক, আমি দাঁড়াচ্ছি।

এই একটি মেয়ে—নীলাম্বরের মনে হল, এই একটি মেয়েই গ্রামে আসবার পরে তাকে সহজভাবে নিতে পেরেছে। বয়সে ছ'সাত বছরের ছোট হলেও ছেলেবেলায় এই মেয়েটি ছিল তার সঙ্গী—নীলাম্বর তাকে সাঁতার কাটতে শিখিয়েছিল, অল্প বয়েসের অনেক দুরন্তপনায় পদ্ম পাশে পাশে থাকত। তারপর যুগ-যুগান্তর পার হয়ে গেল। নীলাম্বর যখন দেশছাড়া, তখন কবে পদ্ম সংসার করতে গেল, সব হারিয়ে আবার ফিরে এল মা-বাপের কাছে। এদিকে চিরকালের কলঙ্ক বয়ে, দেহে মনে প্রায় নিঃশেষ হয়ে নীলাম্বর যখন গ্রামে এল—তখন পদ্ম সব নতুন করে শুরু করেছে।

এখন সে নির্ভুলভাবে দুটো-চারটে ইংরেজি শব্দ আওড়াতে পারে, লেখাপড়া কিছু শিখেছে, সহজভাবে চলে ফিরে—তার কাছে জীবন আর একটা দিগন্ত খুলে দিয়েছে। চারিদিকের পৃথিবীটা বদলাচ্ছে—মানুষ বদলাচ্ছে—শুধু নীলাম্বরই নিজেকে কোথাও মানিয়ে নিতে পারছে না। একটা অন্ধকার পার হতে গিয়ে আর একটা অন্ধকারের জটিলতায় জড়িয়ে যাচ্ছে।

তার বাড়ীতে, এই গ্রামে—কেউ তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না।

এমন কি, পীতাম্বর পর্যন্ত তাকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। ভাইপো-ভাইঝিরা সহজে তার কাছে আসে না, মলিনা জোর করে অনাবশ্যক স্নেহ দেখায়, দুলালী তো ভাগ্যের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। শুধু এই পদ্মর মুখেই সকালের আলোর মতো কী একটা সে দেখতে পায়, কখনো কখনো মনে হয়, এই মেয়েটি তার পাশে এসে দাঁড়ালে হয়তো সে অনেক বেশি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারত।

কিন্তু কী পাগলামি—কী অর্থহীন ভাবনা।

বাইরে শীতের রোদও ধারালো হয়ে উঠেছে, পথ ফাঁকা। গাছের পাতায় পাতায় হাওয়ার শব্দ। নীলাম্বর দোকানের ডালাগুলো বন্ধ করে পদ্মর সঙ্গে এগিয়ে চলল।

পদ্ম বললে, নীলুদা, তুমি তো আমাদের বাড়ীতে একদিনও গেলে না।

সে কারো বাড়ীতে গেলে যে তারা খুশি হয় না, এই রূঢ় সত্যটা পদ্মকে বলতে তার বাধল। আবছা হেসে নীলাম্বর বললে, সময় পেলে যাব একদিন।

—এই চারমাসে তোমার সময় হল না?

—হবে শিগগিরই।—নীলাম্বর কথাটা ঘুরিয়ে নিলে: তোর লেখাপড়া কেমন চলছে?

—তারপর?

—তারপর—পদ্মর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: হেলথ্ সেণ্টারের ডাক্তারবাবু বলেছেন, আমাকে শহরে পাঠিয়ে নার্সিং পাশ করিয়ে আনবেন। তারপর আমি এখানেই চাকরি করতে পারব।

—নার্সিং!—নীলাম্বর কিছুক্ষণ পদ্মর দিকে চেয়ে রইল: কাকা কাকিমা আপত্তি করবেন না?

—মা কি আর সহজে রাজী হয়—পদ্ম হাসল: সেকেলে ঘর তো। কিন্তু বাবা বলেছে, তাতে দোষ কি, শহরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই কাজ করে। আমাদের গ্রামের স্কুলেই তো দিদিমণি রয়েছে

তিন-চারজন। পদ্মও কাজ-কর্ম করুক, দু'টো চারটে পয়সা ঘরে নিয়ে আসুক, সেইটেই তো সব চেয়ে সুখের কথা।

নীলাম্বর চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তার ঘরের ভেতরে এই গ্রামের একটা ছবি স্থির হয়ে আছে—পঁচিশ বছর আগেকার ছবি। তখনো সে কলকাতায় যায়নি, তখনো দেশের উপর যুদ্ধ এসে হানা দেয়নি। সেদিনের গ্রামের রূপ আলাদা, মন আলাদা, ভাবনা আলাদা। সেদিন এসব কেউ কল্পনাও করতে পারত? সেই হারিয়ে যাওয়া গ্রামটাকে খুঁজে পেলে আবার তালদীঘির জলে সাঁতার দিয়ে স্কুলের মাঠে হা-ডু-ডু খেলে নিজেকে নূতন করে তুলতে পারত নীলাম্বর। কিন্তু যা হারিয়েছে, তা চিরদিনের মতোই হারিয়েছে। এখানে সে অচেনা হয়ে ফিরে এসেছে—নিজের চারিদিকে একটা নিঃসঙ্গতার আবরণ টেনে রেখে অচেনার মতোই দিনে দিনে জীর্ণ হয়ে যাবে। একটু আগেই ভাবছিল, পদ্ম তার কাছে অনেকটা সহজ। কিন্তু তা-ও কি সত্যি? পদ্মর পাশাপাশি সে কি আর চলতে পারে?

পদ্ম বললে, চুপ করে আছো নীলুদা, কী ভাবছ?

—কিছুই নয়—নীলাম্বর আবার নিঃশব্দে কয়েক পা এগোল, তারপর বললে, আচ্ছা পদ্ম।

—বলো।

—তুই তো আবার বিয়ে করতে পারতিস।

পদ্মর মুখ রাঙা হয়ে গেল: যাঃ কী বলছ!

—কেন, আপত্তি কিসের? তোর সে বিয়ে তো বিয়েই নয়।

—ছিঃ! তা কি হয়?

—কেন হয় না?—কথাগুলো এভাবে বলা উচিত নয় বুঝেও নীলাম্বর ঝোঁক সামলাতে পারল না, অকারণেই সে মনে মনে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল: আজকাল তো এসব চলে। তুইও পারতিস।

মাথা নীচু করে চলতে লাগল পদ্ম। শীতের রোদেও কয়েক ফোঁটা ঘাম জমে উঠলো তার কপালে।

নীলাম্বর আবার বললে, লেখাপড়া শিখছিস, চাকরিও হয়তো করবি, কিন্তু তাতেই কি মন ভরবে? সারা জীবনের ফাঁকিটা তো রয়েই গেল। তোর এখনো সময় যায়নি, এখনো তুই—

পদ্মর গলা জড়িয়ে এল: কী যে বলো নীলুদা, তার মাথামুণ্ডু নেই। এই বয়েসে?

—চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ আজকাল বয়েসই নয়। কলকাতায় অনেক মেয়ে এই বয়েসে বিয়ে করে।

—এ কলকাতা নয়। তা'ছাড়া—পদ্ম হঠাৎ থেমে গেল।

—তা ছাড়া কী?

পদ্ম দাঁড়িয়ে পড়ল, একবারের জন্য। পায়ের সাদা চটিটা দিয়ে রাস্তার একটা খোঁয়াকে ঠুকল দু-একবার, তারপর প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললে, বিয়ে হয়তো একজন বললে তাঁকে করতেও পারতুম, কিন্তু তাঁর তো আর তর সইল না।

নীলাম্বরের মাথার ভেতরে যেন একটা বোমা ফাটল।

—তুই—তুই কার কথা বলছিস পদ্ম?

সদর রাস্তা থেকে পদ্ম পাশের আমবাগানের দিকে নেমে গেল। মুখ ফেরালো না—শুধু যেন চাপা গলায় একটা ভর্ৎসনা শোনা গেল: অনেক বেলা হয়ে গেছে নীলুদা, এবার বাড়ী যাও।

ও কিছু নয়, পদ্মর বলার অন্য একটা অর্থ আছে। কেন নীলাম্বর ভাবতে চেষ্টা করছে যে পদ্ম তাকেই লক্ষ্য করে ওটা বলে গেল? ছেলেবেলার সেই দিনগুলো এখন কোন সমুদ্রের অতলে তলিয়েছে। আজকের নীলাম্বর আর গ্রামের সেরা ছেলে নয়—লোকে আজ তাকে ভয় পায়। নিজের চারদিকে রাহুর ছায়া বয়ে—একটা কলঙ্কিত অর্থহীন অস্তিত্বের জের টেনে, এমন অসম্ভব ভাবনা সে আজ কেন ভাবে?

ভূতগ্রস্তের মতো বাড়ী ফিরল নীলাম্বর। আর ফিরে দেখল বারান্দায় কৃষ্ণগোপাল।

—ব্রাদার, আবার এলুম তোমার কাছে।

শুকনো গলায় নীলাম্বর বললে, আমার সৌভাগ্য।

কৃষ্ণগোপাল হা হা করে হাসল। পান খাওয়া প্রকাণ্ড মুখের আলজিভটা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল তার।

—আরে অত বিনয় কেন? সৌভাগ্য তো আমার। নিজের গরজেই আসতে হল তোমার কাছে।

—আমি কী করতে পারি তোমার জন্যে?

—বলব, বলব, সব বলব। ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। দু-তিন দিন থাকব এখানে। তুমি এবারে চান-টান করো, না খেয়ে বসে আছি তখন থেকে।

অন্দরের দিকে পা বাড়ালো নীলাম্বর। একটা ছায়া নামছে ঘরের ভেতর। কৃষ্ণগোপালের আসাটা তার একেবারেই ভালো লাগেনি।

॥ নয় ॥

দুলালী আর মলিনা খেতে বসেছে রান্নাঘরে। বাইরে কাকডাকা ঝিম্‌ঝিমে দুপুর। বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে চাকার ক্যাঁচক্যাঁচানি তুলে কয়েকটা গরুর গাড়ী চলেছে খড় নিয়ে—হেমন্তের নতুন খড়ের মিষ্টি ভিজে ভিজে গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়; পথের ধারে নয়ানজুলির জল শুকিয়ে এখন তরল কাদা, মুমূর্ষু কলমিলতা আর সেই কাদার গন্ধ নতুন খড়ের সুবাসের সঙ্গে মিশে গেছে। যেন নেশা ধরে যায়।

নীলাম্বর একটা বিড়ি ধরিয়ে চুপ করে বসেছিল আর স্বপ্ন দেখছিল এলোমেলো। পদ্ম কী বলেছিল? কার কথা? সেই ছেলেবেলার দিনগুলো এখনো তার মন আছে? নিরালা আমের বাগানে ঘুরে ঘুরে কোকিলের ডাকের সঙ্গে সাড়া দেওয়া, মাঠ পেরিয়ে কতকাল আগেকার পুরোনো দীঘিটার কাছে চলে যাওয়া আর সাপের ভয় ভুলে গিয়ে তা থেকে পদ্মবীজ তুলে আনা, সাঁতার শেখানো, কখনো বিরক্ত হয়ে মেয়েটাকে এক-আধটা চড়-চাপড় বসানো আর তাই নিয়ে বাড়ীতে বকুনি—এতদিন নীলাম্বরের কাছে এগুলোর কোনো মানেই ছিল না। আজ পদ্ম নতুন করে সব মনের কাছে জাগিয়ে দিলে। হয়তো যার কথা সে বলছিল, নীলাম্বর তাকে চেনেও না, তবু এই কাকডাকা ঝিম্‌ঝিমে দুপুরে, এই নতুন খড় আর নয়ানজুলির গন্ধে—এরা সব তার কাছে কতগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন হয়ে দেখা দিতে লাগল।

—আসতে পারি ব্রাদার?

ঘোরটা কেটে গেল। দোরগোড়ায় কৃষ্ণগোপাল দাঁড়িয়ে।

—এসো।

পান চিবুতে চিবুতে ঘরে ঢুকল কৃষ্ণগোপাল, সেই একমুখ হাসি, ছোট ছোট চোখ দুটোতে একটা চাপা কৌতুক যেন মিটমিট করছে সবসময়। গায়ে সিল্‌কের হাফ্‌-শার্ট, হাতির শুঁড়ের মত মোটা আর কালো একটা বাহুর ওপর চওড়া সোনার তাবিজ। দু' আঙুলে গোটা ছয়েক সোনা-রূপো-পলার আংটি। সন্দেহ নেই, কৃষ্ণগোপালের অবস্থা ভালো।

সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কৃষ্ণগোপাল মুখোমুখি বসল। মিটমিটে চোখ দুটো মেলে হাসির ভঙ্গিতে এমন করে কিছুক্ষণ নীলাম্বরের দিকে চেয়ে রইল যে একটা মজার জিনিস দেখতে পাচ্ছে যেন। নীলাম্বর মাথা ঘুরিয়ে নিলে।

কৃষ্ণগোপাল বললে, কী ভাবছিলে ?

—কিছু নয়।

কৃষ্ণগোপাল যেন করুণ আর কোমল হতে চাইল। উদাসভঙ্গিতে বললে, তোমার জন্য ভারী দুঃখ হয় হে নীলু! এত ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র ছিলে তুমি, সবাই ভাবত একটা আই-সি-এস্ কিংবা জাঁদরেল ডাক্তার ইন্‌জিনিয়ার কিছু হবে। কিন্তু তোমার জীবনটা শেষপর্যন্ত কী হয়ে গেল।

নীলাম্বরের মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠল।

—ওসব কথা থাক।

—থাকবে কেন হে ? এতো শুধু আমার কথা নয়, সারা তল্লাটের লোক এ নিয়ে দুঃখ করে।

নিরুত্তাপ গলায় নীলাম্বর বললে, আমার জন্যে দুঃখ করবার কিছু নেই, আমি বেশ আছি।

—বেশ আছো! একে বেশ থাকা বলে ?—কৃষ্ণগোপাল উত্তেজিত হল ঃ তোমার এত বিদ্যে, এমন বুদ্ধি, তার ওপর কী বলে—তুমি হলে গিয়ে একজন যুদ্ধ ফেরত পাইলট—

সন্দেহ আর বিরক্তিতে নীলাম্বরের চোখ ধারালো হয়ে উঠল।

—তুমি কি আমায় ঠাট্টা করছ, কেষ্ট ?

—ঠাট্টা! তোমাকে!—পানে রাঙানো জিভের প্রায় আধখানা বের করে দাঁতে কাটল কৃষ্ণগোপাল, তারপর মোটা মোটা ঠাণ্ডা আঙুলে খপ করে একখানা হাত চেপে ধরল নীলাম্বরের।

—মাইরি, কালীর দিব্যি—তোমায় আমি ঠাট্টা করতে পারি ?

—এসব কথা এখন ঠাট্টার মতোই মনে হয় আমার।

—ঘাট হয়েছে ব্রাদার, গেঁয়ো ব্যবসাদার লোক—সব জিনিস ঠিক বুঝতে পারি না। কিছু মনে কোরো না—কৃষ্ণগোপাল পকেট থেকে ধাঁ করে একটা সিগারেটের টিন বের করে ফেলল। নীলাম্বরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—নাও—সিগ্রেট খাও একটা।

নীলাম্বর আশ্চর্য হয়ে টিনটার দিকে তাকালো। দামী বিলিতি সিগারেট।

কৃষ্ণগোপালের কুৎকুতে চোখ দুটো কৌতুকে আবার মিটমিট করে উঠল। পানে রাঙানো হাসি গালের দু'ধারে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল: কী দেখছ হে। একেবারে খাস ক্যানাডার মাল, কলকাতার বাজারে খুঁজে পাবে না।

নীলাম্বর ভয়ে ভয়ে একটা সিগারেট তুলে নিলে।

—তুমি পেলে কোথায় ?

কৃষ্ণগোপাল চোখের কোণা দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকালো। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে না। তারপর আস্তে আস্তে বললে, ভায়া হে, সোর্স থাকলে আপনি জুটে যায়।

—তাই নাকি ? এই পাড়াগাঁয়েও ?

—আপত্তি কী। ইচ্ছে করলে কলকাতার চৌরঙ্গীপাড়ার সেরা জিনিসও এখানে আমদানী করা যায়।

আবার চোখের কোণা দিয়ে কৃষ্ণগোপাল তাকালো: মায় এক নম্বর হুইস্কি পর্যন্ত।

নীলাম্বরের গলা শুকিয়ে গেল, মাথার ভেতর দিয়ে যেন আগুন

ছুটতে চাইল। বুকের ভেতর যেন একটা অবাধ্য বুনো জানোয়ার গরজে উঠল একবার। দুর্বলস্বরে নীলাম্বর বললে, ছেড়ে দাও ও-সব কথা, কী হবে হুইস্কি দিয়ে।

—ঠিক কথা, ওসব হুইস্কি-টুইস্কি দিয়ে আমাদের কী দরকার।—কৃষ্ণগোপাল সায় দিয়ে মাথা নাড়ল: আমরা চুনো-পুঁটি, দু'চারটে বিড়ি-সিগ্রেটই আমাদের যথেষ্ট। আমি কথার কথা বলছিলুম। মানে ব্যবসা-ট্যাবসা—সব খবরই একটু আধটু রাখি কিনা।

—ও।

নীলাম্বর দামি সিগারেটটা এতক্ষণে ঠোঁটে তুলে নিলে। কিন্তু ধরাতে গিয়েও পারল না, হাত কাঁপছিল, দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বলে উঠেই নিবে গেল।

কৃষ্ণগোপাল বললে, দাঁড়াও আমি ধরিয়ে দিই।

পকেট থেকে লাইটার বের করে ফস করে জ্বালিয়ে দিলে। তারপর লাইটারটা নীলাম্বরের হাতে দিয়ে বললে, ছাখো।

নীলাম্বর দেখল, উজ্জ্বল রূপালির ওপর মিনার কাজ করা, যেমন সুন্দর গড়ন, তেমনি হালকা। একেবারে নতুন, একেবারে আধুনিক। মেড ইন্ আমেরিকা।

—কেমন দেখছ জিনিসটা?—কৃষ্ণগোপাল জানতে চাইল।

—চমৎকার।

—এও তুমি কলকাতার বাজারে পাবে না। পেলেও যা-তা দাম নেবে ব্ল্যাক্-মার্কেটে।—কৃষ্ণগোপাল যেন আত্মপ্রসাদে ফুলে উঠল।

—কিন্তু তুমি তো সবই পেয়ে যাও দেখছি।

—বললুম তো, সোর্স থাকলে এই পাড়াগাঁয়েও আলাদিনের খেল দেখিয়ে দেওয়া যায়। মানে ফরাসী থেকে এক নম্বর স্কচ—কৃষ্ণগোপাল আবার জিভ কাটল: ছি ছি, আবার ও-সব কথা মনে আসছে! আমরা গরীব মানুষ ও-সব ঘোড়া রোগে আমাদের কী দরকার—অ্যাঁ?

নীলাম্বর জবাব দিল না—মনে হল কে যেন তার জিভটাকে ভেতর দিকে টেনে ধরছে। কৃষ্ণগোপাল আবার তেমনি করে তার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে রইল—যেন ভারী একটা মজার কিছু দেখতে পাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, যাক্ গে, বাজে কথা থাকুক। এই লাইটারটা তুমি রেখে দাও—তোমাকে আমি প্রেজেন্ট করলুম।

—আমাকে!

—কেন, আপত্তি আছে নাকি?—কৃষ্ণগোপাল হাসল: আরে তুমি তো আমার কুটুম হে—আমি কি তোমায় একটা উপহারও দিতে পারি না!

—তা পারো।—নীলাম্বর শুকনো ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নিলে: কিন্তু—

—এর ভেতরে আবার কিন্তু কিসের? তুমি যদি না নাও তাহলে আমি মনে ভারী কষ্ট পাব। আমার জন্যে ভেবো না, আমার সোর্স আছে, ইচ্ছে করলে ডজন ডজন জোগাড় করতে পারি।

সোর্স! এই একটা কথাই তখন থেকে বলে চলেছে কৃষ্ণগোপাল, চোখ দুটো কুৎকুত করছে, ভুরু নেচে উঠছে, একটা চাপা হাসি খেলে যাচ্ছে ঠোঁটের কোণায়। নীলাম্বরের বুক কাঁপতে লাগল।

—সোর্স তুমি কোথায় পেলে?

কৃষ্ণগোপাল চারদিকে চেয়ে দেখল একবার। কেউ ঘরে নেই, কারো শোনবার সম্ভাবনা নেই, তবু মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনল নীলাম্বরের কাছে, ফিস্‌ফিস্ করে বললে, জমিরহাট জানো?

—হয়ত জানতাম, ভুলে গেছি।

—পাকিস্তান বর্ডারের কাছে। সেখানে খামার আছে আমার। বর্ডারের কাছে বলে ভাববার কিছু নেই, খাসা জায়গা। ধানক্ষেত আর আমবাগান। দিনের বেলাতেও ধানক্ষেত পেরিয়ে আমবাগানের ভেতর দিয়ে লোক নিশ্চিন্তে এপার ওপার করে, পাহারা-টাহারা তো

আর নেই, কে দেখতে পাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই খুব ভালো বিজনেস করা যায়—তবে একটু সাহস থাকা চাই।

—বিজনেস?—কৃষ্ণগোপালের কথায় নীলাম্বর চমকে উঠল: তার মানে স্মাগলিং?

—আস্তে ব্রাদার, আস্তে। ভালো কথায় যাই বলো—আসলে সবই তো বিজনেস। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে কে আর ব্যবসা করে—বলো? এই বর্ডারের কারবার করে তো অর্ধেক বিজনেসম্যান লাল হয়ে গেল!

—তুমি কি তাই করো নাকি?

—ইচ্ছে তো হয়, কিন্তু—কৃষ্ণগোপাল একটু কাশল: সাহায্য করার লোক পাই কোথায়? কার একটু সাহস-টাহস আছে, কাকেই বা বিশ্বাস করতে পারি? অথচ চোখের সামনেই কী কাণ্ডটাই না হচ্ছে। সুপুরি আসছে, সুতো যাচ্ছে, ওষুধ-পত্তর যাওয়া-আসা করছে, তা ছাড়া আরো হাজার রকম কী যে চলছে তা বোধ হয় ভগবানও বলতে পারেন না। এই সিগারেট, লাইটার, চাও তো এক নম্বর—কৃষ্ণগোপাল থামল: মানে একটু সাবধানে কাজ-কারবার করতে পারলে দু'এক বছরেই বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা জমিয়ে নেওয়া যায়।

নীলাম্বর স্থির হয়ে কৃষ্ণগোপালের চোখের দিকে চেয়ে রইল। মনে হল, কৃষ্ণগোপাল বদলে যাচ্ছে। একটা চতুর শয়তান ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে তার জায়গায়—সে সুযোগ বুঝে জাল ছড়াতে জানে, জাল গুটিয়ে নিতে পারে। এবার কৃষ্ণগোপালকে দেখে তার ভয় করতে লাগল।

যেন নিতান্তই নিজের সঙ্গে কথা কইছে, এমনি আলতো ভাবে কৃষ্ণগোপাল বলে চলল, আমি সব সময়েই ভাবি, নীলুর মতো এমন লেখাপড়া জানা একটা যুদ্ধফেরত লোক শেষ পর্যন্ত শরৎ ঘোষের দোকানে খাতা লিখেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে! তাও ত্রিশ-চল্লিশ

টাকা মাইনেতে—যাতে আজকাল দু'বেলা পেটের ভাত পর্যন্ত হয় না। অথচ নীলু ইচ্ছে করলে কি না করতে পারে! যদু-মধু বর্ডারে ব্যবসা করে দালান কোঠা বানিয়ে ফেলল, আর নীলু—

নীলাম্বর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: তার মানে তুমি আমায় স্মাগলিংয়ের ভেতরে টানতে চাইছ?

—আহা, আস্তে আস্তে।—কৃষ্ণগোপাল আবার নরম গলায় বললে—আমি তোমায় কিছুই বলছিনে ব্রাদার! তোমার যা ইচ্ছে তুমি করো। আমি শুধু বলছিলুম, শরৎ ঘোষের দোকানে তোমাকে মানায় না। তোমার জন্যে অনেক বড় বড় কাজ রয়েছে।

—সে কাজ এই চোরাই কারবার?

—তা যাই বলো, কোনো শালাই বাদ যাবেন না। আমার সব শা—কৃষ্ণগোপাল সামলে নিলে: দেখা আছে। ফাঁক পেলে কেউই ছেড়ে কথা কয় না। কিন্তু মাইরি ভাই, কালীর দিব্যি—আমি তোমায় কিছুই করতে বলছি না। শুধু চোখের সামনে যা দেখছি, তাতেই মাঝে মাঝে মাথা গরম হয়ে যায়। ভাবি এমন মওকায় আমিও দু'পয়সা করে নিই না।

—আর যদি ধরা পড়ো?

—ধরা পড়বো—জমিরহাটে, হা-হা-হা, কী যে বলো তুমি, এই কয়েকশো মাইল জুড়ে বর্ডার, ক'টা জায়গায় চেক পোস্ট আছে হে? তা যাক্‌গে সে সব কথা। একাজে বিশ্বাসী আর সাহসী লোক সঙ্গে না থাকলে করাও যায় না—আর আমিও সে রকম কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের ভাই বুড়ো আঙুল চুষেই জীবন কেটে যাবে। তুমি আমার ক্লাশ-ফ্রেণ্ড, আর কুটুম—সেইজন্যেই বিশ্বাস করে মনের কথাটা তোমায় বললুম। তুমি আবার কাউকে—

—না—না।

দরজায় চুড়ির আওয়াজ শোনা গেল। উঠে পড়ল কৃষ্ণগোপাল: —তোমার গিন্নী এসে গেছে—বোধ হয় কথা আছে তোমার সঙ্গে।

আমি আজ বিকেলে চলে যাচ্ছি। পরশু তরশু বোধ হয় একবার এদিকে আসব—বাজারে কিছু কাজ আছে! তখন আবার আলাপ-টালাপ করা যাবে।

কৃষ্ণগোপাল উঠে দাঁড়ালো।

নীলাম্বর বললে, তোমার সিগারেটের টিনটা—

—ও তোমাকেই দিয়ে গেলুম, আমার আরো আছে। নীলম্বরকে যেন অদ্ভুত একটা সম্মোহনের ভেতর বসিয়ে রেখে বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল কৃষ্ণগোপাল। আর ভেতরের দরজা দিয়ে দুলালী এসে ঘরে ঢুকল।

॥ দশ ॥

দুলালীর নিঃশব্দ প্রবেশটা খেয়ালই করেনি নীলাম্বর।

সে তখনও নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিল জানালার ধারে, বাইরের দিকে তাকিয়ে। দেখছিল, নাড়া-মুড়ো-ভরা মেঠো পথে কৃষ্ণগোপালের স্থূলকায় কদর্য মূর্তিটা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঝিম্ ঝিম্ দুপুরের রেশটা হয়তো একতিলও বদলায়নি বাইরের দুনিয়ায়—বিরলপত্র বাবলার ডালে নিঃসঙ্গ ঘুঘুর অলস কূজন তখনও ভাসছিল রোদের তাপে, ঝাঁকড়া-চুলো বাঁশঝাড়ের শ্রেণী স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে দূরদিগন্তের দিকে। ওর মনে তখনো রিম রিম করছে অর্ধদণ্ড আগে শোনা পথচল্‌তি পদ্মের ইঙ্গিতময় সেই আধা স্বীকারোক্তি। কৈশোর কালের ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্নের টুকরোগুলো—এই তো একটু আগেও ওর মনের আনাচে-কানাচে উঁকি দিচ্ছিল। হঠাৎ লোভাতুর কৃষ্ণগোপালের কদর্য ইঙ্গিতের কালবৈশাখীতে সে সব সুখস্মৃতি কোথায় উড়ে গেল। মানুষ চিনতে ভুল হয়নি কৃষ্ণগোপালের—সে জানত ঐ জেলফেরত দাগী আসামীটার মনের কোন গহন কোণে মুখ লুকিয়ে বসে আছে একটা কাল সাপ। কৃষ্ণগোপাল লোভের লগি দিয়ে তাকে একটা খোঁচা মেরে গেল। সাপটা ছোবল তুলে ফুঁসে উঠেছে; আর তাই স্তব্ধ মধ্যাহ্নের প্রকৃতি তার সব সৌন্দর্য খুইয়ে বসে আছে নীলাম্বরের চোখে! "ইচ্ছে করলেই কয়েক-বছরে বিশ-পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা—!" পঞ্চাশ হাজার!

ঠিক তখনই খুট্ করে শব্দ হল ঘরের ভিতর। মুখ ঘুরিয়ে নীলাম্বর দেখতে গেল দুলালীকে। এমন অসময়ে, দুপুরবেলা, সে কখনো আসে না এ ঘরে! বস্তুতঃ দিনের বেলা ওদের নির্জনে দেখাই হয় না। দিবাভাগে দুলালী এ সংসারের নিরলস-কর্মী—তার অন্য কোনও

পরিচয় নেই। রাত্রেও অবশ্য তাই—অপরিচিত স্বামীর পুরুষ জৈবক্ষুধা মিটানোর দায়টা সে মেনে নেয়, তার দেহটা।

নীলাম্বর একটু চকিত হয়ে বললে, কিছু বলবে?

'না'-য়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দুলালী; সে দাঁড়িয়েছিল ঘরের অপর প্রান্তে, টেবিলের ধারে। নীলাম্বরের লক্ষ্য হল দুলালীর হাতে সেই দামী লাইটারখানা। কি জানি কেন হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল নীলাম্বর। অযাচিত কৈফিয়ৎ দাখিল করে, কেষ্টদা ওটা আমাকে উপহার দিয়ে গেল।

নতনয়নে দুলালী শুধু বললে, আর ঐ সিগ্রেটের টিনটাও?

—কেন, আমাকে উপহার দেবার হক নেই কেষ্টদার? ও তো তোমার দাদা।

দুলালী এবার বললে—চোখে চোখ না রেখেই—কেষ্টদা লোক ভাল নয়!

হেসে উঠল নীলাম্বর। বললে, আমার চেয়েও খারাপ?

এতক্ষণে মুখ তুলল দুলালী। বলে, তুমি খারাপ এ কথা তো আমি বলিনি!

—মুখে বলনি, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় জান, কেষ্টদা যত খারাপই হোক, জেল খাটেনি, মানুষ খুন করেনি! তাই নয়?

বেদনার্ত হয়ে উঠল দুলালীর মুখ। গ্রাম্য মেয়ে সে, কথার পিঠে কথা বলতে অভ্যস্ত নয়। শুধু বললে, কেষ্টদা লোক ভাল নয়, ওর সঙ্গে মিশতে হবে না। আর···আর এগুলো ওকে ফেরত দিও।

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে নীলাম্বরের। কেন—তা সে জানে না। হয়তো ওর ঐ অযাচিত উপদেশে, মোড়লিতে; হয়তো তার প্রশ্নের জবাব না দেওয়ায়—অর্থাৎ নীরব সম্মতিতে তাকে কৃষ্ণগোপালের চেয়েও ঘৃণ্যতর জীব বলে মেনে নেওয়ায়, অথবা হয়তো ঐ অঙ্কশায়িনী উত্তীর্ণযৌবনা নারীর হৃদয়টি জয় করার ব্যর্থতায় ক্ষেপে উঠল সে। কঠোর কণ্ঠে বললে, একটা কথা বলি! তোমার বাবা

সব জেনেশুনেই আমার ঘাড়ে তোমাকে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। তুমিও সব জেনেশুনেই এসেছ এ সংসারে। ফলে ও-সব নীতিবাক্য আমাকে না শোনালেও চলবে। অসৎসঙ্গে আপত্তি থাকলে যে-কোন দিন বাপের বাড়ী ফিরে যেতে পার। দরজা খোলাই আছে।

এই দ্বিতীয়বার তুলালী ওর চোখে চোখ রাখল। কিছু একটা বলতে গেল, বলল না। নীরবে লাইটারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

—শোন। এদিকে এস তো—

—না। এঁটো বাসনগুলো এখনও ধোওয়া হয়নি।—নিরুত্তাপ উদাসীনতায় কথাগুলি ছুঁড়ে দিয়ে তুলালী বেরিয়ে গেল।

নীলাম্বর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। পকেট থেকে বিড়ি-দেশলাই বার করতে গিয়ে মাঝ পথে থেমে পড়ে। উঠে-যায় টেবিলের কাছে। অনেক-অনেক দিন পরে ফিল্‌টার টিপ 'কেন্ট' সিগারেটের আস্বাদ পেল আবার। নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ঘন-নীলাভ ধূম্রজাল!

রাতে তু-ভাই পাশাপাশি পিঁড়ি পেতে যখন নৈশ আহার সারছিল তখনই কথাটা তুলল নীলাম্বর—দাদা কদিনের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে দিন সাতেক দেরী হবে।

পীতাম্বর একটু চমকে ওঠে। সংবাদটা অপ্রত্যাশিত। বললে, কোথায় যাবি? ক'লকাতা?

মনে মনে হাসল নীলাম্বর। দাদার কাছে সব সর্বনাশের মূল খুঁটি ঐ কলকাতা শহর। গম্ভীর হয়েই বললে, না। কেষ্টদা তার বিজনেসে একজন পার্টনার চায়। যাব—'জমিরহাট'—ঐ যেখানে ওর কারবার। বলছিল, ভাল প্রসপেক্ট আছে—দেখেই আসি!

পীতাম্বর সন্দিগ্ধ চোখে বার তুই চোরা চাউনি হানল! তারপর বলে, কিসের বিজনেস?

—সব রকমই। নিজে চোখে না দেখলে কেমন করে বলব? —নীলাম্বর ছোঁয়াচ বাঁচানো জবাব দেয়।

—কিন্তু তোকে পার্টনার হিসাবে নিয়ে ওর লাভ? তোর তো মূলধন নেই—

—না। ও একজন ওয়ার্কিং পাটনার চায়। মানে বিশ্বস্ত কোন লোক, যে হিসাব বোঝে, চুরি চামারি করবে না।

—মাইনে কড়ি কী দেবে?

—এখনও কথা হয়নি। তবে ঐ কঞ্জুস শরৎ ঘোষের চেয়ে বেশি।

পীতাম্বরের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শরৎ ঘোষের বয়স তার চেয়েও বেশী। পীতাম্বর গ্রাম-সম্পর্কে তাঁকে 'কাকা' ডাকে, আপনি আজ্ঞে করে কথা বলে। অথচ তার চেয়ে ক-বছরের ছোট নীলু সেই বৃদ্ধকে তাঁর বয়সের মর্যাদাটুকুও দিতে চায় না। এই হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা। শহুরে শিক্ষা। নীলাম্বর এ-কথা মনে রাখতে চায় না যে, ঐ শরৎ-খুড়োই জেল ফেরত খুনী আসামীকে এক কথায় চাকরি দিয়েছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তা এমন হঠাৎ করে চলে গেলে ঘোষ-খুড়োর তো খুব অসুবিধা হবে।

—তা একটু অসুবিধা তো হবেই। কিন্তু ধর যদি আমার সাতদিন জ্বর-জ্বারিই হয়, বুড়োর দোকান কি চলবে না?

—তা বটে! কিন্তু 'জমিরহাট' জায়গা শুনেছি ভাল নয়, মানে···

মাঝপথেই থেমে যায়। নীলাম্বরও তাগাদা দেয় না, কোন কৌতূহল দেখায় না। তবু কথাটা মাঝপথেই থেমে থাকল না। দু' ভাইকে আহার্য সাজিয়ে দিয়ে মলিনা বসেছিল সমুখেই, তালপাখা হাতে। বললে, জায়গা ভাল নয় মানে? ম্যালেরিয়া?

পীতাম্বর মুখ তুলে বললে, না অস্বাস্থ্যকর জায়গা বলতে চাইছি না। মানে, ইয়ে···বর্ডারের কাছে তো। অমর দারোগা বলছিলেন, ওখানকার হাটে চোরাকারবারীদের বড় উপদ্রব।

নীলাম্বর নিঃশব্দে আহার শেষ করতে থাকে।

—তোমাকে আর দুটি ভাত দেব ঠাকুরপো?

শিরশ্চালনে অস্বীকার করে নীলু। অমর দারোগার নাম উল্লেখেই তার আহারের রুচি চলে গিয়েছিল।

—ওমা। সে কি? দুধ দিয়ে দুটি খাবে তো? ও ছোট! দুধটা দিয়ে যা।

রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েছিল অবগুণ্ঠনবতী। কপাটের আড়ালে তার দীর্ঘকায়া অবলুপ্ত, কিন্তু রান্নাঘরের টেমির আলো প্রবেশ পথে তার একটি ছায়া বিছিয়ে রেখেছিল। মলিনার আহ্বানে সে কিন্তু এগিয়ে এল না। শৈলীই দু-বাটি দুধ নামিয়ে রাখে দু-ভাইয়ের পাতের কাছে। মলিনা একটু বিরক্ত হয়। রান্নাঘরের দিকে ফিরে বললে, আর দুটি ভাত নিয়ে এস তো—

প্রয়োজন হল না। এক চুমুকে দুধটুকু গলাধঃকরণ করে নীলাম্বর ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

পীতাম্বর আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল সেদিকে। তারপর দুধের বাটিটা টেনে নিল। আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। সে জাত স্কুল-মাস্টার। মানুষের আচরণের মূলে প্রবেশ করতে চায়। ওর মনে হল বয়ঃজ্যেষ্ঠ কারও সঙ্গে আহারে বসলে এভাবে কখনও সে হুট করে উঠে পড়ত না। পার্শ্ববর্তীর আহার শেষ হওয়ার অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করত—অন্ততঃ তাঁর অনুমতি নিয়ে আসন ত্যাগ করত। সেদিন ইংরাজির মাস্টার-মশাই টিচার্সরুমে একটা কথা বলছিলেন: 'জেনারেশন গ্যাপ।' কথাটা কিন্তু নীলুর ক্ষেত্রে খাটে না। মাত্র কয়েক বছরের ছোট সে। এ শুধু শহুরে আবহাওয়ার কুফল। গেঁয়ো ভূত দাদাটির সঙ্গে ওর মিল হয়নি অন্য কারণে। শুধু দাদার সঙ্গেই বা কেন—ঐ মলিনা, শৈলী এমনকি হয়তো নতুন বৌমাও ওকে এড়িয়ে চলে। কারণটা কি শুধুই ওর শিক্ষা-দীক্ষা জীবন দর্শনের প্রভেদ? নয় কি এ সেই কালযুদ্ধের একটা প্রতিক্রিয়া? অথবা যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে ওর জীবনে—সেই বিশ্রী মামলা, জেল, খুনী আসামীর কলঙ্কের বোঝা—

—কি হল ? আর তুটি ভাত নেবে ?

মরমে মরে যায় পীতাম্বর। হঠাৎ খেয়াল হয় আহার শেষ হবার পর পুরো পাঁচ মিনিট সে অন্যমনস্কের মতো এঁটোপাতায় আঙুল দিয়ে আঁকি-ঝুকি কাটছে।

—না না। আমার খাওয়া হয়ে গেছে।—আসন ত্যাগ করে উঠে পড়ে। উঠানের ও-প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াতে জলভরা ঘটিটা এগিয়ে দিল নতুন-বৌমা। মুখ মোছার গামছাটি পাট করে রাখা আছে জলচৌকিতে। উবু হয়ে মুখ ধুতে বসল পীতাম্বর। হঠাৎ নজর হল নীলুর ঘরের জানালা থেকে একটা ঘননীল ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে বিসর্পিল ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসছে জোনাকজ্বলা গ্রাম্য-আকাশে। নীলু বিড়ি খায়, এটা জানা ছিল তার দাদার—কিন্তু এ'তো বিড়ির ধোঁয়া নয়। এ যে শহুরে ধূম্রজাল ! বিজাতীয়, বিসর্পিল !

—ঠাকুরপো, শুয়ে পড়েছ নাকি ?—ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে নীলাম্বর। এ সময়টিতে বাড়ীর বড় বধূর পরিবর্তে ছোট বধূরই কক্ষে প্রবেশ করার কথা। নীলাম্বর মশারির বাইরে এসে বলে, না বৌদি। কী ব্যাপার ?

—সারাদিন তো তোমার সময়ই হয় না, তুটো গল্প করতে এলাম।

নীলাম্বর দ্বারের বাইরে নজর দিল। দাদা নিজের ঘরে গিয়েছেন। শৈলীরা নিশ্চয় শুয়ে পড়েছে। এ বাড়ীর নবাগতা একজনের সাড়া শব্দ নেই। বোধ করি রান্নাঘরের পাট সারছে, অথবা কে জানে দ্বারের বাইরেই হয়তো উৎকর্ণ হয়ে আড়ি পাতছে। নীলাম্বর অনুভব করে—তুটো গল্প করতে মলিনা আসেনি আদৌ। বিশেষ কোন কথা বলতে এসেছে। কথাটা কী ?

—কই কেষ্টবাবু তোমাকে কি বিলিতি দেশলাই দিয়ে গেছে দেখি ?

মনে মনে ভ্রূকুঞ্চন করল নীলাম্বর। এ গুহ্যতথ্য মলিনার জানার কথা নয় ; কিন্তু ঘরের ভিতরেই যার বিভীষণের বাস তার আবার

গোপন কথা ? নীলাম্বর লাইটারটা জ্বেলে দেখায়। জ্বেলে-নিবিয়ে বারে-বারে। মলিনা যন্ত্রটা নিজের হাতে নিয়ে পরখ করে। নেড়ে-চেড়ে দেখে রেখে দেয়। মুখে বলে, বেশ জিনিসটা।

নীলাম্বর আগ বাড়িয়ে বললে, তোমার বোন বলছিল এটা ফেরত দিয়ে দিতে।

—ওমা ফেরত দেবে কেন ? এমন সুন্দর টোপটা—

—টোপ ? মানে ?

—ওটা তো দাদন হিসাবে তোমাকে দিয়েছে, তাই নয় ? যাতে তুমি ওর ব্যবসায় যোগ দাও।

—কে বলল ?

—কে আবার বলবে। ছোট বলছিল—

—তোমার ছোট'র মনটাও ছোট। তাই জিনিসটা এই চোখে দেখছে। কেষ্টদার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে সে আমাকে একটা উপহার দিতে পারে না ?

—রাগ কর না ঠাকুরপো: কিন্তু ভেবে দেখ—সম্পর্কটা তো দু-তরফেই। তুমি কি পার কেষ্টদাকে ঐ রকম একটা দামী উপহার দিতে ?

—কেন পারব না ? আজ না পারি, কাল পারব। তোমরা কি মনে কর ঐ শরৎ ঘোষের মুদি-দোকানেই আমার জীবনটা শেষ হবে ?

মলিনা ঘনিয়ে এসে নিম্নস্বরে বললে, তাই যদি শেষ হয় ঠাকুরপো তবু আমাদের মনে কোনও দুঃখ থাকবে না। এই গ্রাম্য জীবনেই আমার শ্বশুরমশাই তৃপ্ত ছিলেন, তোমার দাদাও এই গাঁয়ের স্কুলেই কাটিয়ে দিলেন—কই তাঁরও তো কোনও ক্ষোভ নেই। তুমিই বা এমন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হতে চাইছ কেন ?

—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ মানে ? কী বলতে চাইছ ?

—কী বলতে চাই তা তুমি ভাল করেই জানো ঠাকুরপো। তোমার দাদার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পার না ? সে সমস্ত চেষ্টা দিয়ে

অতীতটাকে ভুলতে চেয়েছে, চেয়েছে তার ছোটভাই আবার সহজ হয়ে সেই পুরোনো দিনগুলিতে ফিরে আসুক। সেই স্পোর্টস্‌ম্যান, সেই ঝলমলে স্বাস্থ্য, গাঁয়ের স্কুলের সেরা ছাত্র, বাবার সেই স্বপ্ন—

বিরক্ত হয়ে নীলাম্বর বলে, কী সব আজেবাজে বকছ বৌদি! আমি কি করতে চেয়েছি? একটা গ্রাম্য মুদির দোকানে চাকরি করব—এই স্বপ্নই কি দেখতেন বাবা? আমি যদি মানুষ হতে চাই তাতে তোমাদের এত অশান্তি কিসের?

—মানুষ হতে চাও? ঐ কেষ্টগোপালের সাগরেদ হিসাবে—

—হ্যাঁ! তাতেই বা দোষ কি? কেষ্টগোপাল কিছু ডাকাতির সর্দার নয়—

—তুমি ঠিক জান?

—জানি কে তোমাদের এই সব কুমন্ত্রণা যোগাচ্ছে। কিন্তু আগেই বলেছি তার ছোট মন, তাই সবকিছুকেই সে ছোট করে দেখছে।

এবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল মলিনার। বলল, ঠিক আছে ঠাকুরপো, যা ভাল বোঝ কর। আমি বাধা দেবার কে? ও-কথা আর বলব না। তবে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, তোমার ভালর জন্যই। কিছু মনে করবে না তো?

নীলাম্বর বুঝে উঠতে পারে না, এবার আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে হবে। বলে, কী!

একটু ইতস্ততঃ করে মলিনা বললে, আজ দুপুরে তুমি যখন দোকান বন্ধ করে বাড়ী আসছিলে তখন তোমার সঙ্গে কে ছিল বল তো?

রীতিমত অবাক হতে হল নীলাম্বরকে। বললে, কেন বলতো? পদ্ম ছিল।

—পদ্ম? আমাদের পদ্ম ঠাকুরঝি?

—পদ্ম আর এ-গাঁয়ে কটা আছে বৌদি? কিন্তু কেন বল তো?

—ওর সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হল?

—দোকানে। একখানা কাপড়-কাচা সাবান কিনতে এসেছিল।

—তারপর ? দোকান থেকে দত্তবাড়ীর আমবাগান যে এক-পো রাস্তা গো—

—দত্তবাড়ীর আমবাগান ! তার কথা উঠছে কেন ?

—সেখানে দাঁড়িয়েই তো তোমরা দুজনে গল্প করছিলে ভর দুপুর বেলায়—একেবারে নির্জনে ! তাই নয় ?

নীলাম্বরের চণ্ডালে রাগ চড়ছে। বললে, তুমি কেমন করে জানলে বৌদি ? তুমি তো তখন ছিলে বাড়ীতে ?

—না ঠাকুরপো। আমি নিজে চোখে দেখিনি। দেখলেও সেটা দোষের মনে করতে পারতাম না ; কিন্তু এটা তো কলকাতা শহর নয়—গাঁ-ঘর। সদু পিসিকেও তাই দুষতে পারি না। পিসি তোমার ভালর জন্যই আমাকে সাবধান করে দিল। বললে, তোমার ঠাকুরপোকে বল বৌমা, এটা গ্রামদেশ। পদ্ম বেধবা-মানুষ, অমন পরপুরুষের গা-ঘেঁষে ভর দুপুরবেলায় আমবাগানে গল্প করলে গাঁয়ে তার বদনাম রটতে কতক্ষণ ?

নীলাম্বর স্তম্ভিত হয়ে গেছে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রাম ! ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে এখানে কিছু নেই। সমাজ এখানে চলবে ঐসব সদু-পিসি আর পীতু নন্দীর শাসনে ! একটা গ্রামের মেয়ে রীতিমত লেখাপড়া শিখে নার্সিং পাশ করলেও কোন পরপুরুষের সঙ্গে এখানে নির্জনে দুটো কথা বলতে পারবে না। তাহলেই এ গ্রাম্য-সমাজের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে !

নিতান্ত মেয়েলী কৌতূহল—মলিনা জানতে চাইল—কী গল্প করছিলে গো তোমরা ? অমন নির্জন আমবাগানে ?

হঠাৎ জ্বলে উঠল নীলাম্বর। বললে, শুনতে চাও ? আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন পদ্ম ? কী-বা এমন বয়স তোমার ? তার জবাবে ও কী বললে জান ? বললে, বিয়ে হয়তো একজন বললে তাঁকে করতেও পারতুম নীলুদা, কিন্তু তাঁর তো আর তর সইল না !

যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে গেল মলিনার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে। বললে, কী! কী বললে ঠাকুরপো?

—হ্যাঁ তাই! দুনিয়ার সকলের চোখেই আমার পরিচয় জেল-খাটা খুনী আসামী নয়! এমন অপদার্থকেও ভালবাসতে পারার মত মানুষ আছে দুনিয়ায়! বুঝলে! কিন্তু তোমার তর সইল না। তাই সাত-তাড়াতাড়ি আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলে ঐ বৃষকাঠ!

—চুপ চুপ, চুপ কর ঠাকুরপো! এ-কথা কি গলাবাজি করে বলার! সে হতভাগী হয় তো আশেপাশেই কোথাও আছে! শুনে ফেললে—

—আমি ভ্রূক্ষেপও করি না—সমান তেজে বললে নীলাম্বর।

ঠিক তখনই খোলা দরজায় শোনা গেল—বড়বৌ! শুতে এস, রাত অনেক হয়েছে।

মলিনা মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পীতাম্বর এসে দাঁড়িয়েছেন ছোট ভাইয়ের শয়নকক্ষের সম্মুখে। নীলাম্বরের শেষ কথাগুলো বড় অনুচ্চ ছিল না, কতটা উনি শুনতে পেয়েছেন ভগবান জানেন। মলিনা মরমে মরে গেল।

মলিনা চলে যাবার পর নীলাম্বর আবার একটা সিগারেট ধরালো। ওর মাথার ভিতর তখন কে-যেন হাতুড়ি পিটছে। সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল দুলালীর উপর। সেই বাজে-পোড়া তালগাছটা যদি এভাবে সুড়ঙ্গ কেটে ওর জীবনে হুড়মুড় করে ঢুকে না পড়ত তাহলে নীলাম্বর হয়তো পদ্মকে নিয়ে নূতন করে দু-কড়ি-সাতের ছক সাজাতো। এই গাঁ-ঘরে নয়; না, কলকাতাতেও নয়—একেবারে নতুন দেশে। নতুন পরিবেশে। একদিন এই দুনিয়ায় জীবন যখন শুরু করেছিল তখন কি ছিল না ওর? স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, মেধা—সব ছিল! খেলার মাঠে, স্কুলের পাঠে বারে বারে কুড়িয়ে এনেছে সাফল্যের সনদ। বাবা বলতেন—নীলু একটা মানুষের মত মানুষ হবে, তোমরা দেখে নিও। তারপর ও উড়ল আকাশে। আক্ষরিক

অর্থে, মা-মাটির স্পর্শ হারালো। কালযুদ্ধ ওর জীবন-দর্শনটাকেই দিল পালটে। জীবন নয়, মৃত্যুকে চিনল—অতি নিকট থেকে। মৃত্যু মুঠোয় করে অভিসারে অভ্যস্ত হল। সৈনিক-জীবনের ক্ষণিক বাদে মূল্যবোধটাই গেল হারিয়ে। তারপর পদস্খলন—হত্যা, বিচার, জেল! ফিরে এসেও একতিল আলোর আভাস দেখতে পায়নি। সকলেরই চোখে সন্দেহ, ঘৃণা, পরিহারস্পৃহা, এমন কি ঐ দাদার চোখেও। সহজ সরল জীবনে অভ্যস্ত ঐ পীতাম্বর নন্দী মুখে যতই ভড়ং করুক—সেও খুশি হত ওর ছোট ভাইয়ের ফাঁসি হলে। সব আশাই যখন বিদায় নিল, তখন নিতান্ত নিরাসক্তের মতই একদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজী হয়েছিল। দুলালীর প্রতি কোন মোহ ছিল না তার। নারীদেহের রহস্য অনাবিষ্কৃত নয় যুদ্ধফেরত নীলাম্বরের কাছে। তাই ফুলশয্যার রাত্রে দুলালীর চোখে আতঙ্কের ছায়া দেখে বিরক্ত হয়েছিল, হতাশ হয়নি। কী দিতে পারত সেই বাজে-পোড়া তালগাছটা? মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করার সঞ্জীবনী মন্ত্র কোথায় পাবে সেই উত্তীর্ণ-যৌবনা অনাদৃতা মেয়েটি?

কিন্তু না! এমন একজন ছিল যে হয়তো ভালবাসার জিওন-কাঠি ছুঁইয়ে আবার তাকে মানুষে পরিণত করতে পারত। পরশপাথর সন্ধানী ক্ষ্যাপার মত তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীলাম্বর। কৈশোরের সেই সঙ্গিনীর অন্তরে যে দীর্ঘদিন ধরে একটা পদ্মকোরক সূর্যালোকে চোখ মেলবার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে পাবে এ সত্যটা বিশ্বাস করতেই পারেনি। সে সত্যটা যখন জানল তখন আর উপায় নেই। ওর মুক্তির পথে তার আগেই খাড়া করা হয়েছে ঐ বৃষকাষ্ঠ! দুলালী।

দরজা বন্ধ করার শব্দে হঠাৎ সম্বিত ফিরে এল। দুলালী শুতে এসেছে। জানালা দিয়ে দগ্ধাবশেষ সিগারেটের স্টাম্পটা ফেলে দিয়ে নীলাম্বর প্রশ্ন করে, বৌদির কাছে লাগানি-ভাঙানি করা হয়েছে কেন?

দ্বার রুদ্ধ করে দুলালী ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগের কোনও

জবাব দেয় না। নীরবে মাতুরটা পেতে নেয় মেজেতে। মশারির ভেতর থেকে একটা বালিশ বার করে মাতুরের শিয়রে রাখে।

—ওটা কি হচ্ছে? মেজেতে শোবে নাকি?

তুলালী জবাব দেয় না। নিঃসাড়ে শুয়ে পড়ে মাতুরের উপর। আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে নেয় নিজেকে। মশা এ গ্রামে মারাত্মক।

নীলাম্বর বললে, গ্যাখ, আমার সব সহ্য হয়, ন্যাকামি সইতে পারি না!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসে তুলালী। চাদরটা সরিয়ে দেয় মুখ থেকে, বলে কী ন্যাকামি দেখলে আমার? কী করেছি আমি?

—হঠাৎ মাতুরে শোওয়ার কি হল? রোজ কি এক খাটে শোও না?

অম্লানবদনে উঠে দাঁড়ালো তুলালী। ব্লাউসটা খুলতে খুলতে বলে, কালই তো হয়েছে। আজও চাই? বেশ চল—

নীলাম্বরের ইচ্ছে হল ওর ঐ শীর্ণগালে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসিয়ে দেয়। কোন রকমে আত্মসংবরণ করে বললে, কী ভাব তুমি নিজেকে? তোমার ঐ দেহটা ছাড়া আমার রাতে ঘুম হয় না?

তুলালী জবাব দিল না।

—আয়নায় নিজের দেহটা দেখতে পাও না?

এবার মুখ তুলল তুলালী। বলল, পাই! কিন্তু শুধু আমার বাবাই কি একা জেনে বুঝে আমাকে তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন, তুমিও তো সব জেনে বুঝেই বিয়ে করেছিলে আমাকে—

—তাই নাকি! এই তো বেশ কপ্‌চাতে শিখেছ দেখছি! তুদিনেই মুখে বোল্ ফুটেছে!

খুঁচিয়ে মারলে খরগোসও রুখে দাঁড়ায়। তুলালী বললে, কেন নয়? তোমার কি ধারণা বিধবা মেয়েমানুষই শুধু পরপুরুষের সঙ্গে কপ্‌চায়, সধবা মেয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না?

এবার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল নীলাম্বর! সেই নতমুখী মেয়েটা এতবড় কথা বলতে পারল তাকে? ওর কি ভয়ডর বলেও কিছু নেই?

নির্জন ঘরে যে মানুষটাকে এভাবে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছে সে যে মানুষ খুন করতে পারে এ জ্ঞানটাও নেই!

নীলাম্বর শুধু বললে, এতবড় কথাটা তুমি বললে দুলালী?

—তুমিই তো বলতে বাধ্য করছ! তোমার জীবনটা তোমার নিজের, যা খুশি করতে পার তা নিয়ে, কিন্তু আর পাঁচজনের মাথা হেঁট করবার অধিকার তো তোমার নেই!

—আর পাঁচজন মানে?

—সবারই! আমার, দিদির, বড়ঠাকুরের এবং হ্যাঁ ঐ পদ্ম ঠাকুরঝিরও—

—চুপ কর! ওনাম তুমি মুখে এন না।

ম্লান হাসল দুলালী। বললে, বেশ! রঙ্গ অনেক করেছ! এখন শুয়ে পড়—

নীলাম্বর উঠে পড়ে বিছানায়। মশারিটা গুঁজে দিতে দিতে বললে, কথাটা যেন মনে থাকে। ও নাম যেন তোমার মুখে দ্বিতীয়বার না শুনি! তাহলে তার ফল ভাল হবে না।

আবার উঠে বসেছে দুলালী, আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে। গলা টিপে মেরেও ফেলতে পার—কিন্তু পাড়ার পাঁচজনের মুখ তুমি বন্ধ করবে কীভাবে? ভুলে যেও না, বাহাদুরী দেখাতে তুমিই পাঁচকান করছ। ছি-ছি-ছি! মাঝরাতে বড়ঠাকুর পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন—এতেও তোমার লজ্জা হয় না? পদ্ম ঠাকুরঝির সঙ্গে তোমার অবৈধ প্রণয় কি এমনই একটা জিনিস যাতে গলাবাজি করে বড়ঠাকুরকে পর্যন্ত ঘুম থেকে তুলতে হবে?

এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে পায় নীলাম্বর। ছি-ছি! দাদা কি সে-কথা শুনতে পেয়েছেন নাকি? তাই কি উঠে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ছোট ভাইয়ের দোরগোড়ায়? দুলালীর মুখে পদ্মর নাম দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হতে শুনে তার কঠিন তিরস্কার শুনে, নীলাম্বর এবার আর জ্বলে ওঠে না। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে।

॥ এগারো ॥

সাতদিন নয়, একেবারে দশদিন পাড়ি দিয়ে গ্রামে ফিরে এল নীলাম্বর।

এবার আর ভুল করেনি। পূবপাড়া রেল স্টেশানে নেমেছিল। সেখান থেকে পাকা সড়ক বেয়ে বাসে করে গাঁয়ে যখন এসে পৌঁছালো তখনও রাত ঘন হয়নি। শরৎ মুদির দোকানে তখনও টেমি জ্বলছে, মায়ের মন্দিরে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি সবে থেমেছে, মহিমবাবুর বৈঠকখানা থেকে পড়ুয়া ছেলেদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। বাস থেকে সে একাই নামল।

দ্বিজপদ কামার বসেছিল তার ছাপরাটার সামনে চারপাইয়ে। বয়স হয়েছে, চোখে ছানি। আন্দাজে ঠাওর করে বললে, বাবু-মশয়ের কোথা যাওয়া হবে ?

নীলাম্বর হেসে উঠল, খুড়ো আমাকে চিনতে পারলে না ? আমি নীলু, নীলু নন্দী !

—ও ! আমাদের পীতুমোড়লের ছোট ভাই ? তা কেমন করে চিনব বল ভায়া ! তোমার বেশবাসই যে অন্যরকম ! তাছাড়া সাঁঝের পর কিছু ঠাওর হয় না ! তা এলে কোত্থেকে ?

—কলকাতা ! আজ চলি খুড়ো। পরে এসে একদিন আলাপ করব।

দ্বিজপদ কর্মকারের দোষ নেই। আজ নীলাম্বরের অঙ্গে কর্ডের প্যাণ্ট, ঊর্ধ্বাঙ্গে টেরিলিনের সার্ট, হাতে একটা সুটকেশ। চোখে ছানি না পড়লেও সে আচমকা ওকে চিনতে পারত না। শুক্লপক্ষের রাত—গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে টাকা-টাকা জ্যোৎস্নার ছোপ পড়েছে বনপথে। জোনাকি জ্বলছে ঝোপে-ঝাড়ে। পাখ-পাখালির কলগুঞ্জন

থেমেছে। এক প্রহর রাতেই গ্রাম হবে নিশুতি। এখনই লোকজনের যাতায়াত কমে গেছে।

নীলাম্বর হন্ হন্ করে হাঁটছিল। ব্যাগটা ভারি। অনেক কিছু সওদা করে এনেছে। নিজের জন্য, তুলালীর জন্য, দাদা-বৌদি, শৈলীর জন্য। তাছাড়াও প্যান্টের হিপ-পকেটে এখনও মজুত আছে খান সাত আট করকরে একশ টাকার নোট! দশ দিনে রোজগার বড় মন্দ হয়নি। কৃষ্ণগোপাল বড় মিথ্যে বলেনি—এভাবে চালাতে পারলে বছর না ঘুরতেই বিশ ত্রিশ হাজার টাকা পুঁজি জমে যেতে পারে। কৃষ্ণগোপালও খুশি, ওকে পেয়ে। বেটার বুদ্ধি আছে, নেই সাহস! আর সাহস এক্ষেত্রে কতটুকু প্রয়োজন? যুদ্ধক্ষেত্রের বোমারু বিমানের পাইলটের কাছে এ বিপদ নিতান্ত তুচ্ছ। প্রথম তিন চারটে অভিযান তো একেবারেই জ'লো। নীরন্ধ্র অন্ধকারে মাঠ-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে ওপারে মাল পৌঁছে দেওয়া, আর এপারে মাল নিয়ে আসা। ভূতের ভয় যার নেই তার কাছে এ কাজে কোনও থ্রিলই নেই। গত পর্শুই তবু কিছুটা বৈচিত্র্য এসেছিল—বর্ডার পুলিশ গুলি ছোঁড়াতে। ওরাও নিরস্ত্র ছিল না। পালটা জবাব দিয়েছে। নীলাম্বরের গুলিতে ও-পক্ষের কেউ হতাহত হয়েছে কি না টের পাওয়া যায়নি, ওদের নিজেদের দলে সিরাজুদ্দিনের পায়ে একটা গুলি লেগেছিল। এমন কিছু মারাত্মক আঘাত নয়। জানে মরেনি কেউ। তবু ঐটুকুতেই ঘাবড়ে গেল ভুঁড়িসর্বস্ব কৃষ্ণগোপাল। বললে, 'দু-চারদিন কাজ-কারবার বন্ধ থাক ভাই।' অগত্যা ভাগ-বাঁটোয়ারা শেষ করে যে-যার মত ঘরে ফিরেছে। শুক্লপক্ষটা যাক, আবার কৃষ্ণপক্ষে আঁধার রাতের কারবারিরা জমায়েত হবে। কেষ্টগোপাল বলেছে সময়ে সকলকে খবর পাঠাবে। উপায় নেই। মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া ম্যান-ইটারের সামনে দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাছাড়া ইচ্ছে করলেও এখন সে এ কর্মচক্র থেকে সরে আসতে পারবে না। এ কয়দিনে সে কৃষ্ণগোপালের কারবারের ঘাঁৎ ঘোঁৎ সব জেনে ফেলেছে,

সব ক'জন সাকরেদকে চিনে ফেলেছে—এখন তাকে ওরা রেহাই দিতে পারে না, কিছুতেই নয়।

সাঁওতাল-পাড়ার মোড়টা পার হয়ে নীলাম্বর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। নজরে পড়ে বকুল তলার পাশে একটি কোঠাবাড়ী। অনেক-অনেকদিন এ বাড়ীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে—ভেতরে প্রবেশ করেনি কোনদিন। অথচ ওর নিমন্ত্রণ ছিল, নিমন্ত্রণ আছে! বরং এতদিনের মধ্যে একবারও না যাওয়ায় বারে বারে অভিযোগ শুনতে হয়েছে। এটা মজুমদার মশায়ের বাস্তু—পদ্মর বাবা।

বাসের রাস্তায় আসার জন্য পদ্মর বাড়ীটাই আগে পড়েছে। রাত এমন কিছু বেশি হয়নি। তবু নিজের বাড়ীতে পদার্পণের আগেই ওদের বাড়ীতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? স্যুটকেশের মধ্যে পদ্মর জন্য আনা উপহারটা রয়েছে—বেশ দামী উপহার।

বাড়ীতে পৌঁছানোর আগেই সেটার সদ্‌গতি করে যাওয়াটা মন্দ হবে না। না হলে বৌদি বা আর কারও নজরে পড়লে—

নিজের অজ্ঞাতেই দু-পা এগিয়ে যায় নীলাম্বর। রুদ্ধদ্বারে শিকল নেড়ে হাঁক পাড়ে, নির্মল, নির্মল আছো নাকি?

নির্মল পদ্মর দাদা। নীলাম্বরের প্রায় সমবয়সী। দ্বার খুলে দিলেন মজুমদারমশাই স্বয়ং। কালিওঠা লণ্ঠনটা তুলে ধরে তিনি যেন ভূত দেখলেন—তুমি! নীলাম্বর?

—হ্যাঁ মজুমদার কাকা। ভাল আছেন তো সবাই? নির্মল নেই?

না আবাহন, না বিসর্জন তবু দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। নীলাম্বর প্রবেশ করে ঘরের ভেতর। অযাচিতই একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ে। বলে, গাঁয়ে অনেকদিন এসেছি মজুমদার কাকা। রোজই ভাবি আসব; আসা হয়ে ওঠে না। পদ্ম প্রায়ই অনুযোগ করে—

মজুমদার-গৃহিনী নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিলেন পিছন দিকে।

সেখান থেকেই বলে ওঠেন, পদ্ম ! পদ্ম তোমাকে বলেছে এখানে আসতে ?

ভ্রূকুঞ্চিত হয় নীলাম্বরের। বলে, কেন খুড়িমা, আমি কি গাঁয়ের ছেলে হিসাবে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি না ?

মজুমদার আমতা-আমতা করেন, না না বাবা। তা কেন পারবে না ? তবে, মানে…দিনদশেক তোমাকে গাঁয়ে দেখতে পাইনি তো…

—আমি এখানে ছিলাম না। এইমাত্র বাস থেকে নামলাম। বাড়ীই যাচ্ছি, পথে আপনাদের বাড়ীটা পড়ল, তাই ভাবলাম…

এবারও কেউ বলল না, তা বেশ করেছ ! বস, চা খাবে !

লণ্ঠন হাতে কর্তা, আর বিস্ফারিতনেত্রী গিন্নী প্রতীক্ষা করতে থাকেন—এর পর কি হয় !

—নির্মল নেই বাড়ীতে ?

বাঁ দিকের অন্ধকার থেকে কে যেন বলে, আছি !

মজুমদারমশাই আলোটা তুলে ধরলেন—দেখা গেল অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে নির্মল। সে ওর সহপাঠী ছিল। তার চোখ দুটো মরা খল্‌সে মাছের মত ভাবলেশহীন।

নিরুপায় নীলাম্বর উঠে দাঁড়ায়। স্যুটকেশটা তুলে নেয় হাতে। শেষ প্রশ্নটা পেশ না করে পারে না—পদ্ম নেই বাড়াতে ?

তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন—যেন নীলাম্বর থানার দারোগা, আর পদ্ম ফেরারী আসামী। শেষ প্রশ্নের শেষ-উত্তর কেউ দাখিল করল না। রীতিমত বিরক্ত হয়ে নীলাম্বর বললে, কী ব্যাপার বলুন তো কাকা ? আপনারা আমাকে দেখে এতটা ঘাবড়ে গেলেন কেন ?

—না না, ঘাবড়াবার কি আছে। তুমি তো আমাদের গাঁয়ের ছেলেই—একটু সাহস সঞ্চয় করে ঘনিষ্ঠ হন মজুমদারমশাই। বলেন, ইয়ে হয়েছে—পদ্ম, মানে…ওর জোয়ান বয়স, বিধবা মানুষ…

—তাই কি ? আমি কি ওকে ফ্রক পরা বয়স থেকে দেখছি না ?

মরিয়া হয়ে মজুমদার বলে ফেলেন, গাঁয়ে বাজে লোকের অভাব নেই ভায়া। কু-লোকে অনেকে কথা বলছে। তুমি বরং···মানে?

—কী বলতে চাইছেন আপনি? —রুখে ওঠে নীলাম্বর।

আর তৎক্ষণাৎ তিনটি প্রাণী যেন নীরব আর্তনাদ করে ওঠে! একে একে তিনজনের দিকেই তাকিয়ে দেখল নীলাম্বর। ওদের চোখে মৃত্যুভয়ের আর্তি। যেন এখনই সে ওদের যে-কোন একজনের কণ্ঠনালী দু-হাতে চেপে ধরতে পারে। ঠিক যেভাবে···সেই নষ্ট মেয়েমানুষটাকে সাক্ষী রেখে একদিন নীলাম্বর হত্যা করেছিল তার মদের গ্লাসের সঙ্গীকে।

একটা জান্তব আর্তনাদ আটকে গেল নীলাম্বরের কণ্ঠে! এরা ভুলতে পারেনি—সে জেল ফেরত খুনী আসামী! বিধবা মেয়ের ইজ্জত এরা বাঁচাতে চায়, কিন্তু খুনী আসামীর চণ্ডালে রাগকেও ভয় করে।

ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল পদ্মর সঙ্গে। তার হাতে টর্চ, পায়ে চটি, ড্রেস করে চুলপাড় শাড়ি পরা, এ্যাডাল্ট এডুকেশনের ক্লাস সেরে সে বাড়ী ফিরছে। বোধকরি শেষ দিকের কথোপকথনটা কানে গিয়েছিল তার। বেশ স্পষ্ট স্বরেই বলে, এঁরা ঠিকই বলছেন নীলুদা, তুমি আর আমাদের বাড়ী এস না।

—আমি নিজে থেকে আসিনি পদ্ম। তুমিই আমাকে আসতে বলেছিলে। এবং যখন বলেছিলে, তখন তুমি জানতে আমি জেল ফেরত খুনী আসামী।

পদ্ম বললে, ঠিক কথা। তখন আমি জেনেছিলাম তুমি নতুন মানুষ হয়ে ফিরে এসেছ। ভুল করেছিলাম আমি। তুমি যা ছিলে তাই আছ নীলুদা। ভুল ভুলই। তুমি ক্ষমা কর আমাদের। চল তোমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

মজুমদার-গিন্নী পিছন থেকে বলে ওঠেন, পদ্ম—!

—না মা! ভয় পেয়ো না। নীলুদা আমার কোনও ক্ষতি করবে

না ! কিন্তু কয়েকটা কথা ওকে বুঝিয়ে বলার আছে। আমি এখনই আসছি। এস নীলুদা।

বজ্রাহত তিনজন দর্শককে পিছনে ফেলে টর্চের আলো দেখিয়ে পদ্ম এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে। রীতিমত সম্মোহিত হয়ে নীলাম্বর অনুগমন করল তার ! নির্জন রাস্তায় পড়ে নীলাম্বর বললে, কী কথা বলার ছিল তোমার ?

—কথা সামান্যই। তোমাকে-আমাকে নিয়ে একটা বিশ্রী কানাকানি হয়েছে গ্রামে। তুমি বিবাহিত, আমি বিধবা—সুতরাং আমি চাই কোন ছুতোতেই তুমি আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখ না। নার্সিং শিখে একটা ভেঙ্গে-পড়া সংসারকে খাড়া করে তুলতে চাই নিলুদা—আমার সে স্বপ্নটা তুমি ভেঙ্গে দিও না।

—কে এ সব মিথ্যা রটনা করছে বল তো ? কে সে ?

হাসল পদ্ম। বললে, কী হবে নামটা শুনে ? খুন করবে তাকে ?

—আমি যে তাতেও পিছপা নই তা তো তুমি জান পদ্ম !

—তাহলে তোমাকে আত্মহত্যা করতে হয়। কারণ এ বদনাম যে রটাচ্ছে তার নাম নীলাম্বর নন্দী ! চেন তাকে ?

নীলাম্বর স্তম্ভিত হয়ে যায়, মানে ?

—ছি ছি ছি ! তুমি নাকি নিজেই মলিনা-বৌদিকে বড় গলায় এ সব কথা বলেছ। তোমার একটুও মায়া হল না—এভাবে আমার মাথাটা ধুলায় লুটিয়ে দিতে ? আমাকে অপমান করতে ?

—আমি,···আমি তোমাকে অপমান করেছি ?

—শুধু আমাকে ? আমার একটা সূক্ষ্ম অনুভূতিকে অপমান করেছ তুমি। সে দিন দুর্বল মুহূর্তে যদি আমি কোন অন্তরঙ্গ কথা বলেই থাকি—তা কি ঢাক পিটিয়ে হাটের মাঝখানে বলবার ? অথচ তাই বলেছ তুমি—তোমার বৌদিকে, তোমার দাদাকে, এমনকি তোমার বউকে পর্যন্ত ! তুমি কি মানুষ !

নীলাম্বরের মনে হল—বোধ করি আত্মহত্যাতেই এ পাপের

প্রায়শ্চিত্ত। বললে, আমি ভুল করেছি পদ্ম, অন্যায় করেছি! রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না। আমাকে মাপ কর।

—করলাম। আমাকে অনেক কিছু দিতে পারতে তুমি, দাওনি। অন্তত এখন 'শান্তি'টুকু আমাকে দাও। আমার জীবনের পথে আর কোনদিন এসে দাঁড়িও না।

—বেশ তাই হবে। তাহলে আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে পদ্ম। তোমার জন্য একটা উপহার এনেছিলাম, সেটা—

—না! এমনিতেই আমার জীবন দুর্বহ। আর স্মৃতির ভার চাপিও না তুমি।

ছুটেই ফিরে গেল পদ্ম বাড়ীর দিকে।

স্মুর কাটল। জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হল। বিপরীত দিকে রওনা হল ফের।

মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে থামল বাড়ীর সামনে।

সদর বন্ধ; কিন্তু খিড়কির দরজা খোলা। একটু ইতস্ততঃ করল নীলাম্বর—খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল দাদা তার ঘরে ডোম-তোলা লণ্ঠনটা জ্বেলে হিসাবপত্র দেখছে। হয়তো স্কুলের ছেলেদের হোমটাস্ক অথবা পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র। দাদা চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করে না—সেই বাবার আমলের সাবেক ডেক্‌সো! বসবে মাদুরে, মেরুদণ্ড সোজা করে। সামনে ডেক্‌সোর উপর জ্বলবে ডোম-তোলা বাতি, লিখবে কলমে—কালির দোয়াতে চুবিয়ে। ফাউণ্টেনে জুৎ হয় না পীতাম্বরের। রান্নাঘরের দিক থেকে একটা উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে, বোধকরি ডাল-সম্বরা দিয়েছে বৌদি। শৈলীকেও দেখা যাচ্ছে—বাপের পাশে বসে সে তাঁর পাঞ্জাবিতে বোতাম লাগাচ্ছে। এতক্ষণে মনে হল নীলাম্বরের এই কর্ডের প্যাণ্ট আর টেরিলিনের সার্টটা এখানে বেমানান। এগুলো গায়ে দিয়ে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। কিন্তু বাড়ীতে তো আরও একটি প্রাণী ছিল—তার তো কোন সাড়া শব্দ নেই।

ঠিক তখনই সাড়া পাওয়া গেল। বোঝা গেল, খিড়কির দরজা কেন খোলা। খিড়কির ঘাটে বাসন ধুতে গিয়েছিল দুলালী। ফিরবার পথে খিড়কির দরজায় একজন প্যাণ্টপরা মানুষকে স্যুটকেশ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেও থমকে পড়েছে।

হঠাৎ খুশিয়াল হয়ে উঠল নীলাম্বর। জোনাক-জ্বলা ছোপ-ছোপ জ্যোৎস্নায় বনপথের সীমানায় এমন হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় একটা কৌতুক বোধ করল। বলল, অমন সিঁটিয়ে গেলে কেন? পর-পুরুষ নয়।

দুলালীর দু-হাতে মাজা বাসন। মাথায় ঘোমটা টেনে দেবারও জো নেই। নীলাম্বর স্যুটকেশটা মাটিতে নামিয়ে রাখে। ডান হাতটা বাড়িয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরতে চায়। কিন্তু দুলালী ক্ষিপ্রগামী। চট করে সরে যায়। প্রবেশ করে উঠানে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় রান্নাঘরের দিকে। প্রথম সাক্ষাতেই সুর কাটল। নীলাম্বর প্রবেশ করল।

—কে? কে ওখানে?—ঠিক নজর পড়েছে সদা-জাগ্রত পীতাম্বর নন্দীর।

—আমি। নীলু।

—নীলু? কখন এলি?—খাতা বন্ধ করে পীতাম্বর উঠে এল।

নীলাম্বর ততক্ষণে উঠে এসেছে দাওয়ায়। নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলছে। সাড়া পেয়ে মলিনাও বের হয়ে এসেছে রান্নাঘর থেকে। বললে, ওমা, তুমি! গিয়ে পর্যন্ত একটা চিঠিও তো দাওনি। কোথায় ছিলে এতদিন?

—একদম সময় পাইনি বউদি—আর তাছাড়া রোজই ভাবতাম, কাল-পরশুর মধ্যেই ফিরে যাব, তাই—

পীতাম্বর বলে, তোকে একটা মোড়া-টোড়া এনে দেবে? প্যাণ্ট পরে মাটিতে বসতে—

—না না, তাতে কি?—রীতিমত লজ্জা পেয়েই নীলাম্বর বসে

পড়ে মাদুরের একান্তে। পীতাম্বর আর অপেক্ষা করল না। কোন কৌতূহল নেই তার। একপক্ষকাল তার ভাই কোথায় ছিল, কী করেছে, কত টাকা মাহিনায় নতুন চাকরি পেল, কতদিনের ছুটি—কিচ্ছু না। নিঃশব্দে ফিরে গেল নিজের ঘরে। বসল তার আসনে, মেরুদণ্ড সোজা রেখেই টেনে নিল হিসাবের খাতাটা।

মলিনা বলে, তোমার সার্টটা তো ভারি সুন্দর! নতুন কিনলে বুঝি কলকাতায়? সিল্ক?

—না। টেরিলিন।

—টেরিলিন? তার মানে?

—এক রকম সিন্থেটিক, ও তুমি বুঝবে না।

—কলকাতাতেই ছিলে এতদিন, না জমিরহাটে?

দ্বিজপদকে কলকাতার গল্প শুনিয়েছিল, বৌদিকে পারল না। কলকাতায় সে আদৌ যায়নি। কথা ঘোরাতে তাই ডাকল—ওরে শৈলী। এদিকে আয়। খ্যাখ তোর জন্যে কি এনেছি।

শৈলী এসেছিল আগেই। আজকাল আর সে কাকাকে ভয় করে না। তবু সামনে আসেনি। মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে নিশ্চুপে দেখছিল। ডাক শুনে এগিয়ে এসে প্রণাম করল কাকাকে। তখনই খেয়াল হল নীলাম্বরের, একপক্ষকাল পরে বাড়ী ফিরে তার উচিত ছিল—প্রথম সাক্ষাতে দাদাকে প্রণাম করা। এসব কথা ওর সময়ে মনেই পড়ে না! সেই কাল যুদ্ধটাই সব কিছু ঘুলিয়ে দিয়ে গেছে।

স্যুটকেশ খুলে একরাশ জিনিস বার করল নীলাম্বর—স্নো, পাউডার, লিপ্‌ষ্টিক, সাবান।

খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে শৈলী। বলে, সব আমার কাকু?

—হ্যাঁ সবই তোর। তবে মা চাইলে একটু মাখতে দিস—

মলিনা ঠোঁট উলটায়, দায় পড়েছে আমার এই বুড়ি বয়সে ওসব ছাইভস্ম মাখার।

শৈলী এদিকে ট্যাটন। বলে, আর কাকী যদি মাখতে চায়?

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মলিনা। বলে, নাও এবার জবাব দাও।

নীলু এবারও প্রসঙ্গটা বদলে বলে, আর তোমার জন্য এইখানা এনেছি—

স্যুটকেশের তলা থেকে বার করে লালপাড় একখানা গরদের শাড়ি! বাড়িয়ে ধরে বৌদির দিকে।

মলিনা বলে, আমার হাত এঁটো ঠাকুরপো। এখন রাখ, পরে নেব।

আবার সুর কাটল। শাড়িটা তুলে রাখতে হল স্যুটকেশে।

এ বাড়ীর ছোট বধূর অবশ্য আর সাড়া পাওয়া গেল না। নীলাম্বর ঘরে এসে দেখল চৌকির প্রান্তে তার লুঙ্গি, গেঞ্জি, গামছা, পায়ের কাছে চটি জোড়া রাখা আছে। যে রেখে গেছে তার চিহ্ন মাত্র নেই। মুখ হাত ধুয়ে একবার দাদার কাছে গিয়েছিল—হাতে একটা প্যাকেট। কিন্তু কথাবার্তা কিছু হয়নি। পীতাম্বর বলেছিল, এখন নয় রে, হাতের কাজটা সেরে নিই। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। খাওয়া দাওয়ার পর বসব।

অনেক কথা আছে! কী কথা? ও কোনও হদিস খুঁজে পায় না। মুখ হাত ধুয়ে, লুঙ্গি গেঞ্জি পরে ঘরে ফিরে এসে দেখে তার টেবিলে রাখা আছে একবাটি হালুয়া আর প্লেটে ঢাকা দেওয়া এক কাপ চা। এবারও বোঝা গেল না সেটা কে রেখে গেছে। বৌদি, শৈলী, না আর কেউ। বাড়ীর আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে, যেন ওর অনুপস্থিতিতে একটা কিছু ঘটে গেছে ওর অজান্তে। যেন নিকট কোন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটেছে, আর সে খবরটা সবাই চেপে রেখেছে নৈশ-আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

নীলাম্বর স্যুটকেশটা খুলল। একে একে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখল তার উপহার। বৌদির জন্য গরদের শাড়ি, দাদার ধুতি-চাদর, তুলালীর জন্য একটি মুর্শিদাবাদী আর নিজের জন্য—না ওটা কেনেনি।

কৃষ্ণগোপাল ওটা ওকে উপহার দিয়েছিল। বলেছিল, এটা আমার প্রেজেণ্ট ব্রাদার—তোমার সাফল্যের উপহার।

নীলাম্বর আপত্তি করেছিল। বলেছিল, বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কি হবে? বাড়ীতে এ সব চলবে না।

—আলবৎ চলবে। রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে খাবে শিবের বাবাও টের পাবে না। দুলালী? ওকে পোষ মানাতেই হবে। নিয়ে যাও! খাঁটি ভ্যাটসিক্সটিনাইন! এ মাল পাবে কোথায়? নেহাৎ আমার সোর্স আছে—

বোতলটা আলমারিতে তুলে রাখল। এরপর বের করল একটি পোখরাজের আংটি। খাঁটি সোনার। পদ্মর প্রত্যাখ্যাত উপহার। কী করবে এটা? দুলালীকে দেবে? অগত্যা! যদি মেয়েটা ঠাটামি না করে—

আহারান্তে পীতাম্বর বললে, নীলু একবার আমার ঘরে আয়। কথা আছে তোর সঙ্গে।

প্রস্তুত হয়েই ছিল। নীলাম্বর সুড় সুড় করে ঢুকে পড়ল দাদার শয়নকক্ষে। শৈলী এতক্ষণে ঘুমিয়ে কাদা। ওরা দুই জায়ে খেতে বসেছে। পীতাম্বর ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল। প্রয়োজন ছিল না। তবু কি জানি কেন রুদ্ধদ্বার কক্ষের অন্তরাল চাইছিল পীতাম্বর। হঠাৎ নজর হওয়ায় বললে, তোর হাতে ওটা কি?

—তোমার জন্য ধুতি-চাদর এনেছিলাম।—প্যাকেটটা খুলে ফেলে নীলাম্বর।

হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে না ওর দাদা। বলে, হঠাৎ?

—প্রথম রোজগারের টাকা। সকলের জন্যই কিছু কিছু উপহার এনেছি।

—কই শরৎ-খুড়োর কাছ থেকে যখন প্রথম মাসের মাইনে পেয়েছিলি তখন তো কারও জন্য কিছু আনিস নি?

—তখন ক'টা টাকাই বা পেয়েছিলাম ?

স্থির দৃষ্টিতে পীতাম্বর কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ছোট ভায়ের দিকে। তারপর বললে, সে দিন যদি তুই আমার জন্য এক বাণ্ডিল বিড়ি, তোর বৌদির জন্য এককৌটো জর্দা আর শৈলীর জন্য একগজ লাল ফিতে আনতিস তাহলে আমরা বর্তে যেতাম নীলু!

নীলাম্বর মরমে মরে গেল। মাথা নিচু করে বসে রইল। পীতাম্বর কিন্তু থামল না। বলতে থাকে, অথচ দেখ, ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা! তোর ঐ উপহার আজ আমি হাত পেতে নিতে পারছি না। তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। তোর জন্যই কেঁদে কেঁদে মা মরে গেল। তবু তোর ঐ প্রথম রোজগারের টাকায় কেনা—

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে ওঠে নীলাম্বর, কেন দাদা ?

—আমি যে জানি রে! কীভাবে রাতারাতি তুই এমন বড়লোক হয়ে গেছিস।

—কী ভাবে ?—রুখে ওঠে নীলাম্বর।

—কৃষ্ণগোপালের কারবারটা কী, তা আমি জানি তুই চলে যাবার পরেই অমর দারোগা এসেছিল আমার কাছে। কৃষ্ণগোপালের খোঁজ করতে। সুতরাং আমার জানতে কিছু বাকি নেই নীলু!

মাথাটা আর তুলতে পারে না নীলাম্বর।

পীতাম্বর বলতে থাকে, এবার বলি, যে জন্যে তোকে ডেকেছি। বাবা নেই, তোর ভালমন্দ দেখার দায় আমারই। বাপ মা স্বর্গ থেকে দেখছেন সে দায়িত্ব আমি পালন করেছি কি না। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তুই আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞাও করেছিলি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আমারই দুর্ভাগ্য। তোকে সৎপথে আনতে পারলাম না। যে পথে তুই পা বাড়িয়েছিস ওখান থেকে ফেরার রাস্তা নেই। কেষ্টগোপালের দল তোকে ফিরতে দেবে না। কিন্তু আমি ছা-পোষা মানুষ। একটি অবিবাহিত কন্যাও আছে। আমার কথাটা বিবেচনা করে দেখ। আমি কি করতে পারি, বল ?

নীলাম্বর ধরা গলায় বললে, তুমি কি চাও ? এ বাড়ীতে আমি না আসি ?

—তুই যতদিন একা ছিলি ততদিন একটা সহজ সমাধানের পথ ছিল। এখন তা নেই। ছোট বৌমার কথাটাও ভাবতে হবে। প্রথম কথা, কালই পঙ্কজনাকে ডেকে আমি পৈতৃক সম্পত্তি দু-ভাগ করব। তোর হিস্যা তুই বুঝে নে। তোর সম্পত্তি, তোর বউ নিয়ে পৃথগন্নই প্রথম। তারপর—

হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল নীলাম্বর।

—অমন উতলা হলে চলবে না নীলু। এ ছাড়া বিকল্প কোন ব্যবস্থার উপায় যদি থাকে তবে বল। আমি তো কোন রাগারাগি করছি না। দুদিন পরেই তোকে পুলিশে ধরবে। আবার এখন সৎ হতে চাইলেও ঐ কেষ্টগোপালের দল তোকে ছাড়বে না। তাছাড়া তোর রক্তের মধ্যেও—

—আমি আর পারছি না দাদা। আজ রাতটা আমাকে ভাবতে দাও। কাল এ কথার জবাব দেব।

—বেশ তাই দিস ! শুতে যা এখন। ওদের খাওয়াও বোধ হয় শেষ হল।

বেরিয়ে আসছিল নীলাম্বর। পিছন থেকে পীতাম্বর ডাকল, এই প্যাকেটটা নিয়ে যা রে নীলু—ওটা ফেলে যাচ্ছিস।

টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে এল নীলাম্বর।

ঘরে মিটমিট করে কালিওঠা একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ঘরের ও-প্রান্তে চুপটি করে বসে আছে দুলালী। নীলাম্বর দরজায় খিল দিল। ঘুরে দাঁড়াতেই এগিয়ে এল দুলালী। বললে, দিদি এটা ফেরত দিলেন।

টেবিলের উপর রাখল গরদের শাড়টা। এতক্ষণে লক্ষ্য হল টেবিলে সাজানো আছে আরও কিছু উপহার—সাবান, স্নো, পাউডার লিপস্টিক !

পীতাম্বরেরই নির্দেশ বোধ হয়। শৈলী সব কিছু ফিরিয়ে দিয়ে গেছে!

খাটের বাজু ধরে আত্মসম্বরণ করছিল। না, কোন মতেই মৃগীর আক্রমণ হতে দেবে না। কেলেঙ্কারী অনেক দূর হয়েছে। ফুলশয্যা রাত্রের প্রহসন যেন আবার না হয়। আস্তে আস্তে বসে পড়ল খাটের উপর। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল দুলালীর দিকে। আশ্চর্য। ঐ নারীটি নাকি তার ধর্মপত্নী, জীবনসঙ্গিনী! তার এতবড় সাফল্যে —এত এত টাকা রোজগার করে ফেরায় সে নির্বিকার। তার এতবড় অপমানে—দাদা-বৌদি মায় এক ফোঁটা শৈলী তার উপহার প্রত্যাখ্যান করায় সে ভাবলেশহীন।

কী করবে এখন নীলাম্বর? পদ্ম ফিরিয়ে দিয়েছে, দাদা-বৌদি-শৈলী ফিরিয়ে দিয়েছে, এখন কি ঐ বৃষকাষ্ঠটাকে পরীক্ষা করে দেখবে? কী লাভ? যেখানে প্রণয় ছিল সেখানেই অপমান পেয়েছে; যেখানে প্রণয় নেই সেখানে আবার নতুন কী পাবে?

এতক্ষণে একটু সামলেছে। বললে, তোমার জন্যও একটা শাড়ি এনেছিলাম। নেবে তুমি?

দুলালী এগিয়ে এল—কই দেখি?

স্যুটকেশ খুলে শাড়িটা বার করে দেখায়।

—চমৎকার তো? এমন শাড়ি আমি বিয়েতেও পাইনি।—বাড়িয়ে গ্রহণ করল।

রমে মরে গেল নীলাম্বর। ওর কাছে প্রত্যাখ্যানটাই ছিল প্রত্যাশার। ও নিশ্চয় বুঝেছে, কোন রোজগারে নীলু এটা কিনে এনেছে। তবু লোভাতুর মেয়েটা সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। মন শাড়ি ও জন্মে পরেছে নাকি?

কৌতূহল প্রবল। এবার আংটিটা বার করে দেখায়।

—এটাও আমার?

—তাছাড়া আবার কার?

—আমি ভেবেছিলাম পদ্ম-ঠাকুরঝির জন্য বুঝি এনেছ ওটা।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নীলাম্বর। এ মেয়েটা কী? মানুষী তো? কৌতূহল প্রবলতর। নিছক সত্যকথাটাই বলে দেখল এবার, ঠিকই ধরেছিলে তুমি। ওটা পদ্মর জন্যই এনেছিলাম। বাড়ী আসার আগেই ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম—

—পদ্মদিও নিল না বুঝি!

—হ্যাঁ তাই! এর পরেও কি তুমি এ উপহারটা নেবে?

হাসল দুলালী! বললে, কেন নেব না? পদ্মদির জিনিস কি এর আগে নিইনি কোনদিন?

—নিয়েছ? কী?

—তুমি!

এবার বজ্রাহত হয়ে গেল। তবু সামলে নিয়ে বললে, দুলালী, তুমি কি জান কীভাবে এত টাকা রোজগার করেছি আমি?

—কেন জানব না? দিদি তাঁর গরদের শাড়িটা ফেরত দেওয়ার সময়েই সব কথা বলেছেন। তা-ছাড়া দিন কয়েক আগে অমল দারোগা এসে যখন বড়ঠাকুরকে বলছিলেন তখনও শুনেছি। আর আমার তো সব কথাই জানা। কেষ্টদাকে যে আমি চিনি—

—তোমার···তোমার আপত্তি নেই এভাবে আমি রোজগার করলে?

—আমার আপত্তি তো তুমি শোননি, শুনবে না।

—তারপরেও তুমি আমাকে······মানে আমার উপার্জনে—

—আমার যে উপায় নেই! আমি তো তোমাকে পৃথগন্ন হতে বলতে পারব না!

অন্নের বন্ধন! ঐ উত্তীর্ণযৌবনা বাজে-পোড়া তালগাছের মত মেয়েটি নিরুপায়। সমাজ-সংসার নীলুকে ত্যাগ করতে পারে, বৌদি তাঁর স্নেহের বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারেন, দাদা পারেন গ্যাংগ্রিন হয়ে যাওয়া ডানহাতখানাকে কেটে ফেলতে। দুলালী কি

পারে না—তার সঙ্গে যে ওর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ! একবার ইচ্ছে হল দস্যু-রত্নাকরের মত প্রশ্ন করতে—আমার এ পাপের অর্ধেক ভাগ তুমি নেবে ?—সে কথাও জিজ্ঞাসা করল না : ঐ গ্রাম্য মেয়েটা শুধু নির্ভর করতেই জানে, এসব সূক্ষ্ম তর্কের জাল বুনানিতে অংশ নিতে পারবে না।

তা হোক, তবু ঐ মেয়েটির এই একান্ত নির্ভরতায় যেন অন্য এক-জাতের সুর আছে—একটা অঙ্গাঙ্গী একাত্মতা ! দাদা ওর উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন, পদ্ম অনায়াসে ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিল—অথচ এই মেয়েটি, যাকে সে স্ত্রীর মর্যাদাই দেয়নি কোনদিন, সে তো ওকে অপমান করছে না, প্রত্যাখ্যান করছে না ! একান্তভাবে ওর উপরেই নির্ভর করছে, ওর সরল সারঙ্গ দৃষ্টিতে নীলাম্বর তার জীবন-মরণের সাথী—হ'ক না কেন সে জেল-ফেরত, খুনী আসামী !

হঠাৎ ওর হাত দুটি টেনে নেয়। কই আজ তো আর সেই হাত দুটি মৃতের করমুষ্টি বলে মনে হল না ! নীলাম্বর বললে, বিশ্বাস কর দুলালী, আমি আবার নতুন করে বাঁচতে চাই, ভাল হতে চাই। মানুষের মত বাঁচতে চাই। কিন্তু এরা আমাকে বাঁচতে দেবে না।

—এরা কারা ?

—এই দেশ, এই সমাজ, আমার দাদা-বৌদি—ঐ অমর দারোগা, ঐ কেষ্টগোপাল, সবাই, সবাই। আমাদের বাঁচবার আর কোনও পথ নেই। আমরা মরে গেছি ! আমরা মৃত।

দুলালী চুপ করে বসে রইল।

—কই কিছু বললে না তো ?

—বলব ? শুনবে তুমি ? আমার কথা শুনবে ?

—শুনব বলেই তো জিজ্ঞাসা করছি।

দুলালী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। গুছিয়ে কথা বলতে শেখেনি বেচারি ? কিন্তু মর্মান্তিক প্রয়োজনে আজ সে কথা বলল ! জৈবিক যৌনক্ষুধা মিটিয়ে দেওয়া ছাড়া যে স্বামীর সঙ্গে তার বস্তুত

কোন সম্পর্কই ছিল না। আজ তার এই দিশেহারা অবস্থা দেখে তার সামনেই মেলে ধরল তার অন্তরের আর্তি। হোক অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে, তবু তার ধমনীতেও তো বইছে লক্ষহীরা রক্ত। স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর চোখে চোখ রেখে বললে,

—তুমি নিজেকে খুব হতভাগ্য মনে কর, তাই নয়?

—নিশ্চয়।. আমার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে তুনিয়ায়?

—আছে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ তুমি। আমি কি তোমার চেয়েও হতভাগী নই?

—তুমি?

—ভেবে দেখ! তোমার যা কিছু তুঃখ তার মূলে তুমি নিজেই। হতে পারে পরিবেশ তোমার উপর প্রভাব ফেলেছিল—যুদ্ধ, মদ, কুসঙ্গ, উত্তেজনা! কিন্তু তোমার যা কিছু তুর্দৈব তা তোমার নিজে হাতে গড়া; নিজে হাতে পোঁতা বিষবৃক্ষের ফসল। তুমি নিজেই নাম লিখিয়েছিলে যুদ্ধে। নিজেই মদ খেতে শুরু করেছিলে—নিজে হাতে খুন করেছ। আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও মাথা গলিয়েছ কেষ্টদার বিবরে। নয়? আর আমি?

—কী তুমি?

—ছেলেবেলায় আমার হাত ফসকে গরম জল পড়ে যায়। তার জন্য আমার দোষ নেই। সেটা নিতান্ত তুর্ঘটনা। অথচ সেই অপরাধে বারে বারে আমাকে দেখতে এসে ওরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করে গেল। আমার যৌবন এল, আমারও বাসনা-কামনা ছিল, কিন্তু কেউ সেটা আমল দিল না। তুমিও দিলে না। বাবার কাছে আমি ছিলাম অন্নভুক্ একটা গলগ্রহ। ভাইয়েরা নিষ্ঠুর উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রইল। ফুলশয্যার রাত্রে হঠাৎ এক লহমার জন্য আমি ভয় পেয়েছিলাম —স্বীকার করছি, তখন সেই খিলবন্ধ ঘরে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল তুমি খুনী আসামী। পরমুহূর্তেই আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি পারলে না। তোমার মৃগীরোগের আক্রমণ হল। তারপর

…তারপর কোনদিনই তুমি আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দাওনি, ভালবাসনি হয়তো পদ্মা ঠাকুরঝির জন্য, হয়তো আমার রূপযৌবনের অভাবে। কেন আমাকে ভালবাসতে পারনি তা আমি জানি না, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার মনেও গোপন ছিল পূর্ণিমার চাঁদ, মেঘে ঢাকা! তুমি জানতে পারনি। জানবার চেষ্টাও করনি—'

একটা ঘন যবনিকা যেন ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে নীলাম্বরের চোখের সামনে থেকে। ঐ যৌবনোত্তীর্ণা তালঢ্যাঙা মেয়েটির ভেতর প্রত্যক্ষ করল এক অদৃষ্টপূর্ব পূর্ণচন্দ্রকে। মগ্নচন্দ্রা!

আবার ওর হাতটা টেনে নিয়ে বললে, আমাকে মাপ কর দুলালী। কিন্তু…কিন্তু বলতে পার কীভাবে তোমাকে নিয়ে আমি বাঁচতে পারি?

—পার! খুব কঠিন কাজ! পারবে তুমি? ভয় পাবে না?

সোজা হয়ে উঠে বসল এক্স-পাইলট নীলাম্বর নন্দী! বললে, ভয়! ভয় আমি জীবনে পাইনি কোন কিছুতে। বল?

—আজ রাত্রেই আমাকে নিয়ে পালাতে পার? এ গাঁয়ে নয়, এদেশে নয়—একেবারে নতুন দেশে, নতুন পরিবেশে। যাব আমরা এক কাপড়ে। নতুন করে ঘর বাঁধব। গতরে খেটে রোজগার করবে তুমি, দাসীর মত সেবা করব আমি! এমন দেশে যাব, যেখানে অমর দারোগা নেই, কেষ্টগোপাল নেই, পদ্মদি নেই। যেখানে তোমার পরিচয় জেল ফেরত খুনী আসামী নয়—একজন মানুষ!

একলাফে উঠে দাঁড়াল প্রৌঢ় মানুষটা। বললে, তাই যাব দুলালী। আমার হাত ধরে তুমি নরক পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত ছিলে, তোমার হাত ধরে আমিও স্বর্গে যেতে প্রস্তুত। আজ রাত্রেই ইতিহাস রচনা করব আমি। নিজের বিয়ে করা বউকে 'ইলোপ' করব! রাত তিনটের আপ গাড়ি আছে পশ্চিমে যাবার। যাবে!

*　　　*　　　*　　　*

চাঁদ হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। রাত্রির বাতাসে স্নান করে তারাগুলো আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পূব আকাশে ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। শেষ রাত্রির একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একজন প্রৌঢ় মানুষ তার স্ত্রীর হাত ধরে পূবমুখো চলেছে—স্টেশানের দিকে। ঐ দিকে সূর্য উঠবে। দুর্জয় সাহস দুজনার। এ পথে খুন-জখম ডাকাতি লেগেই আছে। তা হোক, এক্স-পাইলট নীলাম্বর নন্দী সে জন্য প্রস্তুত। তার ডান পকেটে এখনও আছে ছয়-ছয়টি বুলেটভরা পিস্তল। কেষ্টগোপালের ভ্যাটসিক্সটিনাইনটা ফেলে রেখে গেলেও তার ঐ দ্বিতীয় উপহারটা সে ফেলে যায়নি। ট্রেনে ওঠার পর জানালা গলিয়ে ফেলে দেবে সেটাকে। নীলাম্বর প্র্যাক্টিকাল মানুষ।

দুলালী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কে যায় সামনে দিয়ে? কার হাতে অতবড় লণ্ঠন জ্বলছে একটা?

নীলাম্বর হাসল। বলল, ও কিছু নয়, আলেয়া। ভয় পেও না।

দপ করে নিভে গেল লণ্ঠনটা বদ্ধ জলাটার কাছে। অনেকখানি সরে গিয়ে হঠাৎ জ্বলে উঠল আবার।

দুলালী বলল, ভয় পাব কেন? তুমি তো সঙ্গেই আছো।

———